পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জুলাই — ডিসেম্বর, ২০১৮

আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সমাজ
রোগ পোকার মোকাবিলায় ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্র
প্রকৃতি-বান্ধব চাষ
বায়ুদূষণে কলকাতা সামনের সারিতে
পরিবেশ, প্রযুক্তি, বাজার অর্থনীতি
মানুষ কি একাই থাকতে চায়
পুরুলিয়ার জৈব চাষবাসের আলোচনা

বি ও বি এ-শতকে

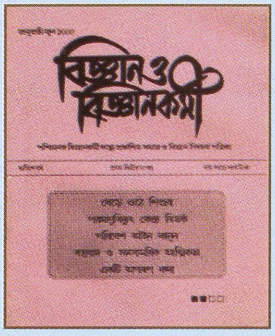

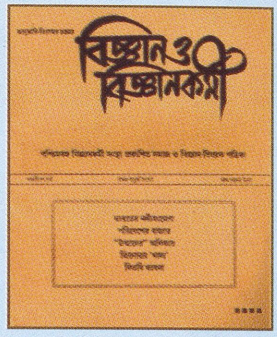

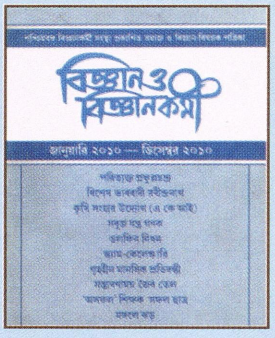

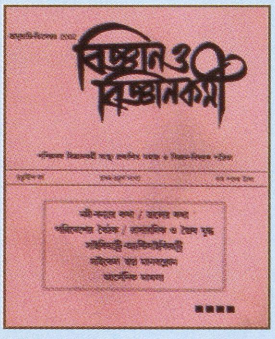

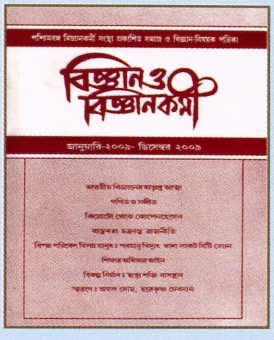

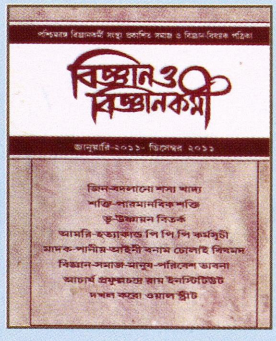

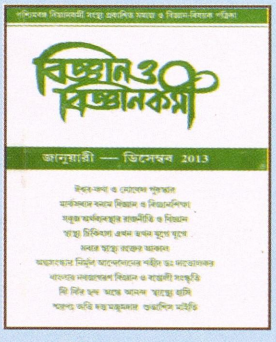

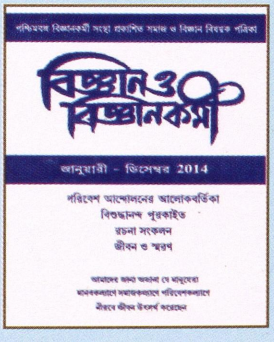

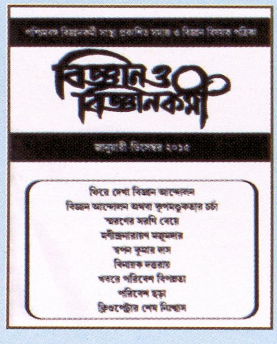

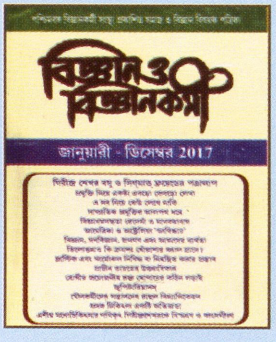

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
পড়ুন ও পড়ান
পুরোনো বি ও বি
সংগ্রহ করুন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 41 সংখ্যা 3–4
জুলাই–ডিসেম্বর 2018
Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 2429/79
Vol. XLI No. 3–4
July 2018 — December 2018

সূচীপত্র

আমাদের কথা— সম্পাদক মণ্ডলী
কে এই গ্রোতেন্ডিক?
—অভিজিৎ লাহিড়ী পৃ.02
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমাজ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা
— অমিত কান্তি সরকার পৃ.10
ধানক্ষেতে রোগ পোকার উপদ্রব বৃদ্ধি : একটি বাস্তুতান্ত্রিক অনুসন্ধান
— অভ্র চক্রবর্তী পৃ.17
প্রকৃতি বান্ধব চাষ ব্যবস্থার সন্ধানে
— অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায় পৃ.26
বাতাসের গুণগত মান : বায়ুদূষণে প্রথম সারিতে কলকাতা
—অপর্ণা চক্রবর্তী পৃ.30
জেলপেন বা স্পেস এজ বল পয়েন্ট পেন কিভাবে এল
—নিখিলেশ পাল পৃ.43
হারিয়ে যাচ্ছে আমার চেনা শহর
—ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী পৃ.45
পরিক্রমা পৃ.46
রিপোর্ট পৃ.49
চিঠিপত্র পৃ.55

Contact :
Rabin Majumdar
rabin.majumdar@gmail.com
B27/1 Kalindi Housing Estate
Kolkata 700 089
Website : www.scienceandsocietyinbob.com

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

আমাদের কথা

'আমাদের কথা'য় কওয়ার মত কথা বলতে ২০১৮-য় বিওবি'র দু'টো সংখ্যা প্রকাশের কথা ছাড়া, তেমন কিছু নেই। কিছুদিন যাবৎ বিওবি বছরে একবারই বের হচ্ছিল। জানুয়ারী-ডিসেম্বর কম্বাইন্ড্ সংখ্যা হিসাবে। বইমেলার সময় বের হচ্ছিল বলে বন্ধুরা তাকে বইমেলা সংখ্যা হিসাবে ভাবতে ও ডাকতে শুরু করে। আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয়। 'ত্রৈমাসিক' বিওবি'র সময়মত প্রকাশ নানা কারণে হচ্ছিল না। এবার বছরে একটার জায়গায় দু'টো সংখ্যা বের করা গেল। এই যা!

বর্তমানে চারিদিকের যা হালচাল, তাতে বিওবি'র দেখার যে চোখ, কওয়ার যে ভঙ্গি, বা, বলা ভাল, লেখার যে বিষয়, তার দরকার থাকলেও থাকতে পারে। বিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক চলার শুরু থেকেই বিওবি সংশয়ীর চোখে দেখেছে, বিচার-বিশ্লেষণ করেছে, এখনও সে ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। হালের পত্র-পত্রিকায় ছোট ও চটুল লেখার যে হিড়িক, সেখানে বিওবি'র বড় ও বিষয়ের গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণাত্মক লেখার কদর, অল্প হলেও, পাঠকের কাছে আছে।

এ সংখ্যায় লেখা থাকছে কৃষি নিয়ে, স্বাস্থ্য ও রোগ-চিকিৎসা নিয়ে, পরিবেশের ভাবনা নিয়ে, মানবতার ধর্মে দীক্ষিত বিজ্ঞানকর্মীর জীবন ও জিজ্ঞাসা নিয়ে।

বিওবি থাকবে না উঠে যাবে তা বলা কঠিন। কিন্তু যে কথাটা বলা যায় তা হল যতদিন বিওবি থাকবে, ততদিন সে, এতদিন যেভাবে কথা বলেছে, সেভাবেই কথা বলার চেষ্টা করবে। এই সংখ্যার লেখাগুলোতে সেইভাবে কথা কওয়ার ব্যাপারটা হ'ল কিনা, বা হলেও কতটা হ'ল, বা না হ'লে কেন হ'ল না, তা দেখার ভার পাঠকের।

মত-প্রকাশে লেখকের স্বাধীনতায় আস্থাশীল বিওবি। লেখা নির্বাচনে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার প্রসাদগুণই বিবেচনা করা হয়। লেখকের সম্মতি না থাকলে বানান ও যতিচিহ্নে ন্যূনতম সংস্কার ছাড়া আর কোনো রকমে লেখায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। — সম্পাদক মণ্ডলী, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'

কে এই গ্রোতেন্ডিক?

অভিজিৎ লাহিড়ী
E-maii : avijit.lahiri.al@gmail.com

আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক এক অতি বিচিত্র, রহস্যাবৃত, ও চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। গাণিতিক উইনফ্রিড সার্লাউ তিন খন্ডে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, প্রথম খন্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গ্রোতেন্ডিকের গাণিতিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় আলোচিত হয়েছে বেশ কিছু নিবন্ধে, কিন্তু এই মানুষটি সম্পর্কে জানা গেছে খুব অল্পই। সার্লাউ-এর একটি নিবন্ধের শিরোনাম অনুসরণ করে গ্রোতেন্ডিকের সামান্য পরিচয়, আমি যতটুকু বুঝেছি, এখানে লিখে জানাচ্ছি।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গাণিতিক কে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন, কারণ 'শ্রেষ্ঠ' কথাটি যথেষ্ট গোলমেলে। তবু, আজকের দিনের এক শ জন গাণিতিককে যদি এই প্রশ্ন করা যায় তবে তাঁদের ভিতর অনেকেই এক বাক্যে উত্তর দেবেন, আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক [১৯২৮-২০১৪]। গ্রোতেন্ডিকের বিপুল গাণিতিক প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা কিছু বড় মাপের গাণিতিক ছাড়া হয়ত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, আমি এই নিবন্ধে সে রকম কোন চেষ্টাই করব না, প্রসঙ্গক্রমে সামান্য দু-এক কথা বলা ছাড়া। বস্তুত, গ্রোতেন্ডিক তাঁর দীর্ঘ জীবনের মাত্র বছর কুড়ি সময় গণিতের চর্চা ও গবেষণায় ব্যয় করেছিলেন, আর এই স্বল্প সময়েই তিনি গণিতের প্রায় পুরো কাঠামোটিকেই, বলা চলে, ঢেলে সাজিয়েছিলেন। আধুনিক গণিতের প্রায় তিন শ' বছরের ইতিহাসে এত বড় কথা যদি কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় তবে তিনি, সম্ভবত, আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক।

তবে এত সব সত্ত্বেও গণিত কিন্তু, এক অর্থে, গ্রোতেন্ডিকের গৌণ পরিচয়। আগামী দিনে মানুষ হয়ত গাণিতিক হিসেবেই তাঁকে মনে রাখবে, কিন্তু তিনি নিজে সারা জীবন ধরে এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জীবনের ও মানব-অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে গেছেন আকুল আন্তরিকতায়, নানা ভাবে, নানান আলোর রেখা অনুসরণ করে—আর শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ব্যাকুল অনুসন্ধান হারিয়ে গেছে এক বিষাদঘন কুহেলিকায়। তিনি রেখে গেছেন বহু হাজার পৃষ্ঠার পান্ডুলিপি, যার অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা কোনদিনই সম্ভব হবে কি না, তা কেউই বলতে পারে না।

গ্রোতেন্ডিকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, ও বঞ্চনার ভিতর, অনেকটা ব্যাধ-তাড়িত প্রাণীর মত, যার কোন পরিচয় নেই, নাগরিকত্ব নেই, রাষ্ট্রশক্তির তাড়া খেয়ে যাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে, সব-হারানোদের এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে। এইখান থেকে শুরু হয়েছে তাঁর পথ খোঁজা—অনুসন্ধানের পথে কখনো তিলমাত্র আপোষ করেন নি কারো সঙ্গে, এমন কি নিজের সঙ্গেও। এক অজানা শুদ্ধতার সন্ধানে জগৎ-সংসার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে জীবনের শেষ ত্রিশ বছর সময় ধরে আত্মিক মোক্ষ খুঁজেছেন, মানুষকে শুদ্ধতা ও শান্তির দিশা দেখানোর আশায়। দীর্ঘ পথ-চলায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন রাজনৈতিক চর্চায়, যুক্ত হয়েছেন বামপন্থী রাজনীতিতে, যুক্ত হয়েছেন যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনে, কিন্তু খুঁজে পাননি তাঁর অভীষ্ট পথ। অনন্ত নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত মানুষটি শেষ পর্যন্ত রেখে গেছেন বহু হাজার পৃষ্ঠার পান্ডুলিপি.....।

আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিকের অসাধারণ ও 'অস্বাভাবিক' জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায় রচিত হয়েছিল তাঁর বাবা-মায়ের জীবনকাহিনীতে। গ্রোতেন্ডিকের বাবা আলেকজান্ডার শাপিরো ছিলেন এক নৈরাজ্যবাদী মানব-স্ফুলিঙ্গ। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানে তিনি ছিলেন সক্রিয় সৈনিক। দু বছরের তীব্র সংগ্রামের পর তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সকলেই কারারুদ্ধ হন, সকলেরই প্রাণদণ্ড হয়, কেবল শেষ মুহূর্তে তাঁর অল্প বয়সের বিবেচনায় তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। দশ বছর কারাবাসের পর অক্টোবর বিপ্লবের অস্থিরতার পর্যায়ে তিনি পালিয়ে গিয়ে এক ইউক্রেনীয় সমরনায়কের অধীনে নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শে প্রভাবিত কৃষক বাহিনীতে যোগ দেন। তীব্র লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত বলশেভিকদের হাতে তিনি আবার কারারুদ্ধ হন, এবং আবার তাঁর প্রাণদণ্ড ঘোষিত হয়। আবার পালানোর চেষ্টায় নিজের বাঁ হাতটি হারিয়ে তিন শেষ পর্যন্ত পৌঁছন পশ্চিম ইউরোপে। জাল পরিচয়পত্র সহযোগে প্রথমে বার্লিন, তারপর প্যারিসে ভ্রাম্যমান আলোকচিত্রীর জীবন শুরু করেন এবং আবার বার্লিনে ফিরে হাঙ্কা গ্রোতেন্ডিককে তাঁর চলার পথের সহযাত্রিণী রূপে গ্রহণ করেন— ১৯২৮ সালে জন্ম হয় আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিকের— আগামী দিনে যিনি আলোড়িত করবেন গণিতের জগৎকে, আর তার পর আবার দ্রুত নিজেকে নির্বাসিত করবেন সেই জগৎ থেকে।

জীবনের প্রথম পাঁচ বছর গ্রোতেন্ডিক তাঁর বাবা-মায়ের অভিভাবকত্বে অতিবাহিত করেন এক অনিশ্চয়তার শৈশব, কারণ নিশ্চিন্ত সাংসারিক জীবন কাটানো কোনমতেই সম্ভব ছিল না আলেকজান্ডার শাপিরো (ওরফে তানারফ)-এর পক্ষে। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের অভ্যুত্থানের পর বার্লিন তাঁর পক্ষে হয়ে উঠল বিপজ্জনক—আবার তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে। এই সময় হাঙ্কা তাঁর শিশুপুত্র আলেকজান্ডারকে এক পরিচিত পরিবারের অভিভাবকত্বে রেখে প্যারিসে চলে যান তানারফের কাছে, এবং দু জনে গিয়ে যোগ দেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে—এক্ষেত্রে অবশ্য সক্রিয় অংশগ্রহণের বদলে তাঁদের ভূমিকা ছিল সমর্থকের। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনী জয়লাভ করায় আবার দুজনে ফিরে আসেন প্যারিসে, তবে সেখানেও প্রবল বিপদের মুখোমুখি হলেন তানারফ, কারণ তিনি জন্মেছিলেন ইহুদী পরিবারের সন্তান রূপে। শেষ পর্যন্ত জীবনে শেষ বারের মত বন্দী হলেন তানারফ, জার্মান বন্দী শিবিরে নিহত হলেন মানব-মুক্তির এই অনন্যসাধারণ সৈনিক, আগামী দিনে যাঁর পুত্র মানুষের মুক্তির মশালটিকে বয়ে নিয়ে চলবেন ভিন্ন পথে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯, এই পাঁচ বছর গ্রোতেন্ডিক জার্মানির হামবুর্গে তাঁর অভিভাবক পরিবারটির তত্ত্বাবধানে স্কুলে পড়াশুনা করেন, কিন্তু তার পর আবার শুরু হয় তাড়া খাওয়া জীবন। গ্রোতেন্ডিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর মায়ের কাছে প্যারিসে (না হলে হয়ত নাৎসীদের হাতে পড়ে তখনই চিরতরে হারিয়ে যেতেন তিনি)। 'শত্রু-দেশ'-এর নাগরিক বলে হাঙ্কাকে ছেলের সঙ্গে অন্তরীণ করা হয় অধিকার-হীন মানুষদের শিবিরে, যেখানে গ্রোতেন্ডিকের পড়াশুনা চলে ছাঁড়া ছাড়া ভাবে। শেষ পর্যন্ত অনেকটা সৌভাগ্যবশেই এক সংগ্রামী মানুষের সহায়তায় তিনি পৌঁছন দক্ষিণ ফ্রান্সের লে শ্যাঁবন গ্রামে, যেখানকার মানুষেরা কমিউন গড়ে নাৎসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে আশ্রয় দিয়েছিলেন বহু মানুষকে (লে শ্যাঁবন আজও তাই প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল নাম)। এখানে থাকাকালীন গ্রোতেন্ডিক পড়া শুরু করেন এক বেসরকারী বিদ্যায়তনে, যার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ছিল শান্তি, অহিংসা, ও মানবতার প্রসার। এই বিদ্যায়তনেই তাঁর জীবনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপাধি অর্জন করেন আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক। এর পর আবার অনেকটা সৌভাগ্যের যোগাযোগেই মঁতপেলিয়ের শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পান তিনি

(সম্ভবতঃ তাঁর মা এই শহরে কোন কাজের সন্ধান পেয়েছিলেন)—এখানে শুরু হয় গণিত-চর্চা। তবে গোড়া থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, গ্রোতেন্ডিককে দেওয়ার মত বিশেষ কিছুই নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগটিতে। অল্প বয়স থেকেই গ্রোতেন্ডিকের অনুসন্ধিৎসা ছিল, দৈর্ঘ্য, আয়তন, এগুলিকে ঠিকমত বোঝা। এই আগ্রহের সূত্রেই তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই একা হাতে পুনরাবিষ্কার করেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অঁরি লেবেগের নামাঙ্কিত সমাকলন (integration) পদ্ধতি, এবং পরিচিত হন গণিতের বিস্ময়-বালক হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরামর্শে ১৯৪৮ সালে গ্রোতেন্ডিক যান প্যারিসে, পরিচয় লাভ করেন ফরাসী গণিতের তৎকালীন মহারথীদের—তাঁর অস্তিত্বের গভীর প্রদেশে এক বিশাল অনুরণন সৃষ্টি করে গণিত। প্রতিষ্ঠিত গাণিতিকেরা দেখেন, গণিতে প্রায় দিব্যদৃষ্টির অধিকারী এই যুবকের আনুষ্ঠানিক জ্ঞান খুবই অপ্রতুল। তাঁদেরই দু-এক জনের পরামর্শে গ্রোতেন্ডিক ন্যান্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিউদোনেকে গণিতে তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন। ন্যান্সী তখন ফরাসী গণিতের পীঠস্থান, কারণ সেখানে ছিলেন দিউদোনে ও প্রবাদপ্রতীম লরাঁ সোয়ারৎজ। মূলত এঁদের দু জনের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ (সোয়ারৎজ গণিতের সর্বোচ্চ সম্মান ফীল্ডস মেডাল লাভ করেন ১৯৫০ সালে—আর মাত্র ষোল বছর পর যা লাভ করবেন তাঁরই ছাত্র আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক)। সোয়ারৎজ ও দিউদোনে গ্রোতেন্ডিককে সোয়ারৎজের লেখা একটি গবেষণা-নিবন্ধ পড়তে দেন, যার শেষে ঐ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে চৌদ্দটি অমীমাংসিত গাণিতিক সমস্যার এক তালিকা সংযোজিত ছিল। মাত্র কয়েক মাসের ভিতর গ্রোতিন্ডিক তার প্রতিটির সমাধান নির্ণয় করেন। এই সময় থেকেই গ্রোতেন্ডিকের প্রতিভা অতি দ্রুত প্রখর সূর্যের মত উদ্ভাসিত হতে থাকে। কয়েক বছরের ভিতরই তিনি গাণিতিকদের ভিতর অবিসংবাদিত মহানায়কের স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন।

গ্রোতেন্ডিকের গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় দেওয়া এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সে সাধ্যও আমার নেই তিলমাত্র। গ্রোতেন্ডিক মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বহুবিধ আপাত-বিরোধী উপাদানের এক জটিল সমন্বয়, যার তাৎপর্য অনুধাবন হয়ত কোনদিনই পুরোপরি সম্ভব হবে না গবেষকদের পক্ষে। এর ভিতর ছিল তাঁর গাণিতিক সত্তা, তাঁর প্রতিবাদী ও রাজনৈতিক সত্তা, আর তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তা। এবারে আসব সে কথায়।

উনশ শ' পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ গ্রোতেন্ডিক আধুনিক গণিতের এক জীবিত কিংবদন্তীর আসন লাভ করেন। ঐ সময় ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় গণিত ও পদার্থবিদ্যায় গবেষণার এক কেন্দ্র, যার সংক্ষেপিত নাম IHES—প্রতিষ্ঠাতা মানুষটি ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী, তবে গণিতে আগ্রহী। গ্রোতেন্ডিক এই গবেষণা-কেন্দ্রে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং অচিরেই হয়ে ওঠেন ফ্রান্সের উঠতি প্রজন্মের অসাধারণ প্রতিভাধর এক গবেষক-গোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক। তবে তারই মাঝে IHES-এর প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধারের সঙ্গে ক্রমশ তৈরী হতে থাকে দূরত্ব, নানান প্রশাসনিক ও মতাদর্শগত বিষয়ের কারণে। প্রায় এক যুগ সময়কাল ধরে বিস্তৃত ছিল সেই ঐতিহাসিক পর্যায়, যখন গণিত চলেছিল আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিকের অঙ্গুলিহেলনে। আর তারপর এল, গ্রোতেন্ডিকের নিজের বর্ণনায়, 'এক মহান উত্তরণের পালা'— IHES থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন গ্রোতেন্ডিক। এর পর ধাপে ধাপে বছর কুড়ি সময় ধরে গ্রোতেন্ডিকের জীবন-চর্চায় দেখা গেল একের পর এক বাঁক, যার রহস্য ভেদ করতে পারেন নি এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ মানুষ-জনও। শেষ পর্যন্ত, ১৯৯০-এর কোন এক সময় জগৎ-সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে অজ্ঞাতবাস শুরু হল তাঁর। গণিতের দীর্ঘ ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক নিখোঁজ হলেন এক কুহেলিকার অন্তরালে।

IHES থেকে অবসর নেওয়ার আপাত-দৃশ্য কারণটি ছিল, গবেষণার অর্থ কোথা থেকে আসছে তাই নিয়ে গ্রোতেন্ডিকের আপত্তি, কারণ এই অর্থের একটি অংশ আসত সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে। গ্রোতেন্ডিক বরাবরই ছিলেন সামরিক-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যের বিরোধী—গবেষণার অর্থ সামরিক সূত্র থেকে আসছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। প্রথমে কয়েকটি বৈঠকের পর ঠিক হল, সামরিক সূত্র থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করা হবে। কিন্তু পরে গ্রোতেন্ডিক জানলেন, সামরিক অনুদান বন্ধ হয় নি। এর পরই নিলেন অবসর। যবনিকা পড়ল গণিতের ইতিহাসের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ স্বর্ণযুগটির উপর।

এই সময়ই গ্রোতেন্ডিক সক্রিয় ভাবে শুরু করেন প্রতিবাদী ও রাজনৈতিক কাজকর্ম—এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ১৯৬৬-তে, গ্রোতেন্ডিক যখন ফীল্ডস পুরস্কারের অনুষ্ঠানে রাশিয়ায় যেতে অস্বীকার করেন, সেখানকার স্বৈরতান্ত্রিক ও অবদমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তাঁর প্রতিবাদী চর্চার কেন্দ্রে ছিল পারমাণবিক শক্তি বিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন, ও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। এর জন্য তিনি গড়ে তোলেন এক সংগঠন, যাতে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যোগ দিয়েছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক গাণিতিক ও বিজ্ঞানী।

গ্রোতেন্ডিকের এই প্রতিবাদী চর্চার প্রেক্ষাপটটি ছিল, উনিশ শ' ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার উত্তাল ছাত্র আন্দোলন। তাঁর ভিতর গভীর অনুরণন তুলেছিল এই আন্দোলন, যার তুলনায় তাঁর অনেকটাই অসার মনে হয়েছিল গণিতের গবেষণা। ফ্রান্সের বহু অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী সমর্থন করেছিলেন এই আন্দোলনের ভাবধারাকে, কেউ কেউ সক্রিয়ভাবে যোগও দিয়েছিলেন আন্দোলনে। তবে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ সমর্থন যোগালেও সরে আসেন নি তাঁদের পেশাগত ক্ষেত্র থেকে। গ্রোতেন্ডিক সরাসরি যোগ না দিলেও তাঁর জীবনে ঘটে গেল 'মহান উত্তরণ'—অবলীলায় ছেড়ে এলেন গণিতের পাদপ্রদীপ, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন গোটা পৃথিবীর গাণিতিকদের বিস্ময়-বিহ্বল স্বীকৃতির পুষ্পবৃষ্টি থেকে।

গ্রোতেন্ডিক অন্তর থেকে ছিলেন শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী– এ ব্যাপারে তাঁর বাবার পথ ও তাঁর পথ ছিল আপাত-দৃষ্টিতে অনেকটাই ভিন্ন, কিন্তু বস্তুত দুইয়ের ভিতর ছিল এক মৌলিক ঐক্য। ষাটের দশকের শেষে গ্রোতেন্ডিক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সফর করেছিলেন উত্তর ভিয়েতনাম—ভিয়েতনামিদের উপর নৃশংস আক্রমণ আর ভিয়েতনামিদের প্রতিরোধ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁকে। ফিরে এসে নানান বক্তৃতায়, এমনকি গণিতের বক্তৃতার মঞ্চেও, মানুষকে জানিয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। অবশ্য কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার ভিতরেই যে ক্ষমতা ও আধিপত্য বাসা বেঁধে থাকে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সচেতন। সারা জীবন ধরে যেখানেই দেখেছেন অবদমনের বীজ সেখানই প্রতিবাদ করেছেন তিনি, সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। সম্ভবত সেই একই কারণে এবারে তিনি তাঁর নিজের সংগঠন, সংগঠনের বাইরে আন্দোলনের বৃহত্তর মঞ্চ, এবং তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতির বৃত্ত থেকেও গুটিয়ে নিতে থাকলেন নিজেকে। গোড়ায় তিনি প্যারিসের কাছে এক কমিউন গড়ে সেই কমিউনেই দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষজনের সঙ্গে, কিন্তু ১৯৭৩-এ এল আর এক 'উত্তরণ'—শহর ছেড়ে মঁতপেলিয়েরের কাছে এক গ্রামে এসে বাসা বাঁধলেন গ্রোতেন্ডিক—এর পর আর শহরে ফিরে যান নি—গ্রাম ছেড়ে গ্রামে, দরিদ্র পল্লী থেকে দরিদ্রতর পল্লীতে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে থাকলেন ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাণিতিক আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক।

তবু, এই পর্যায়েও, গণিত-চর্চা পুরোপরি ছাড়েন নি তিনি। মাঝে-মধ্যে এখানে সেখানে অস্থায়ী অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন (তাঁকে অধ্যাপনার পদ দিতে পারলে সেই সময় বর্তে যেত বিশ্বের বহু প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়), গাণিতিক বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন গণিতের প্রসঙ্গ ধরে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই গণিত এসেছে আরো বড় মাপের— অনেক বড় মাপের—নানান প্রশ্নের সূত্র ধরে। গ্রোতেন্ডিক একের পর এক লিখে গেছেন কাব্যধর্মী নানান চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি, যেখানে তিনি ধরতে চেয়েছেন জীবনের অনেক ঊর্ধে অবস্থিত কোন বৃহৎ 'সত্য'কে, গণিত যেখানে বিলীন হয়ে গেছে শান্তি ও মুক্তির আকুতিতে।

অবশেষে এল অন্তিম 'উত্তরণ'— ১৯৯১-এর কোন এক সময়ে তাঁর শেষ আশ্রয়টিও ছাড়লেন গ্রোতেন্ডিক, চলে গেলেন লোকালয় থেকে অনেক দূরে, বহুদিন ধরে যার কোন হদিশ পাননি কেউই। এই অজ্ঞাতবাসে বসেই তিনি লিখে চললেন 'ভর হওয়া' মানুষের মত। তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেদের মতে, এই সময়েই তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে থাকা বিরোধী সত্তাগুলি কোন নিরসন বা মীমাংসার পথ না পেয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে স্খলিত করেছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব অস্তিত্বের ভারকেন্দ্রটিকে। অজ্ঞাতবাসের পর্যায় শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় নি সে আকর্ষণ। এর পর তিনি আশ্রয় খুঁজলেন খ্রীষ্টধর্মের এক সম্প্রদায়ের ভাবনার জগতে, এবং তখন থেকেই নানান আপাত-অযৌক্তিক 'সত্য' ও 'গূঢ়-দর্শনের' আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তাঁর নানান পাণ্ডুলিপির লেখায়। এই পাণ্ডুলিপিগুলির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ধ্যান'—পর পর বেশ কয়েকটি ধ্যানের ভিতর উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, নিগূঢ় উপলব্ধি, ও মুক্তির আকুতি।

কে এই আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক? কী তাঁর পরিচয়? কী দিয়ে তৈরী হয়েছিল তাঁর মানস-সত্তা? এই মানস-সত্তার ভিতর কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল তাঁর গাণিতিক বোধ, যার উদ্ভাসে আলোড়িত হয়েছিল গণিতের জগৎ? গণিতের সঙ্গে কোন সূত্রে বাঁধা ছিল তাঁর 'ধ্যান'—সে বাঁধনেই কি নিস্পেষিত হয়েছিল তাঁর গাণিতিক আত্মা? এই ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন গবেষকরা আগামী বহু বছর ধরে—তবু হয়ত অধরা থেকে যাবে সেই উত্তর—কে এই আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক?

অনুমান করা চলে, গ্রোতান্ডিকের মানস-সত্তার এক মৌলিক উপাদান ছিল তাঁর বাবা-মায়ের জীবন-দর্শন বা, বলা চলে সেই জীবন-দর্শন তাঁর বোধে ও মননে যেভাবে ধরা দিয়েছিল সেই অনুভূতি। বিশেষত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে তাঁর বাবার ভূমিকা অনেকটাই নির্ধারিত করেছিল তাঁর জীবনের গতিমুখ— অবদমনের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন মনোভাব, শুদ্ধতার সন্ধান, সামান্যতম দ্বিচারিতাও সইতে না পারা, এ সবই তিনি নিশ্চয় পেয়েছিলেন 'উত্তরাধিকার' সূত্রে (তাঁর ঘরে টাঙানো থাকত বাবার প্রতিকৃতি), কিন্তু একই সঙ্গে বাবার অন্তিম পরিণতিও নিশ্চয় মেনে নিতে পারেন নি তিনি, তাই বাবা যেখানে বেছেছিলেন অবদমন-আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষ-হীন, বিরাম-হীন, তীব্র সঙ্ঘাতের পথ, ছেলে সেখানে জীবন নিয়োজিত করলেন সেই শুদ্ধতার সন্ধানে, যেখানে শুদ্ধতা ও শান্তির উপর ছায়াপাত করে না ক্ষমতা, আধিপত্য, দ্বিচারিতা, ন্যায়-অন্যায়ের জটিল দ্বন্দ্ব। মানুষের ভিতর এই শুদ্ধতাই নিরন্তর খুঁজে গেছেন ঐকান্তিক আকুলতায়— কিন্তু না, পান নি, কোথাও পান নি সেই শুদ্ধতা যা দেখিয়ে দেবে সংঘাত-হীন অপার শান্তির পথ।

এই শুদ্ধতাই কি তিনি খুঁজেছিলেন গণিতের জগতে? গাণিতিক সৃজনী-প্রতিভার উৎস কী—শুধু গণিত কেন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানান

ধরনের সৃজনী-প্রতিভার উৎস কী—এ নিয়ে আলগা চর্চা বহু যুগ ধরেই চলে আসছে, কিন্তু বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক চর্চা খুবই অপ্রতুল। একটি কথা হয়ত অনেকটা নিঃসংশয়েই বলা চলে—আমাদের ধারণার জগতে আপাত-দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন নানান ধারনার ভিতর নতুন সমন্বয় সাধন করে অভিনব নানান ধারণা সৃষ্টির ক্ষমতা এর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্যে-বিজ্ঞানে-গণিতে এমনটাই লক্ষ করা যায়, তবে গণিতের ক্ষেত্রটি একটু স্বতন্ত্র, কারণ এখানে ধারণাগুলির ভিতরকার সম্পর্ককে মেনে চলতে হয় এক প্রস্থ নিখুঁত ব্যাকরণ, অর্থাৎ এক প্রস্থ যৌক্তিক নীতি, যা গাণিতিক যথার্থ্যকে করে তোলে প্রকৃতই সর্বজনীন, গাণিতিক বিবৃতিগুলিকে দেয় এক অমোঘ, অলঙ্ঘ্য সত্যের দ্যুতি। গাণিতিক ধারণার এই জগৎটিকে যদি কল্পনা করা যায় এক অসীম-মাত্রিক মন্ডল রূপে, তবে সেই মন্ডলের অন্তর্গত দূরবর্তী ধারণাগুলিকে সমন্বিত করে অভিনব ধারণা সৃষ্টি কোন মামুলী যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় না—এর জন্য চাই গাণিতিক 'অন্তর্দৃষ্টি'— বলা চলে, কোন এক পোঁয়াকার, গাউস, ভন নয়ম্যান, বা গ্রোতেন্ডিক সেই অসীম-মাত্রিক মন্ডলটির ভিতর খুঁজে পান এমন এক সুড়ঙ্গপথ যার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব এক প্রস্থ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়, যা অভিনব হলেও মেনে চলে গণিতের নিখুঁত ব্যাকরণ। আর, এই অন্তর্দৃষ্টির মূল প্রোথিত থাকে গাণিতিকের অচেতন মানসলোকে, যেখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে, গাণিতিকের নানান ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, ব্যক্তিগত তাড়না, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-ব্যর্থতা। এখান থেকেই ঊর্ধ-পাতিত হয়ে সৃষ্টি হয় গণিতের সেই নিখুঁত, ব্যাকরণ-সম্মত, অলঙ্ঘ্য, ধারণাগুলি।

বিখ্যাত গাণিতিক-পদার্থবিদ ডেভিড রুয়েল তাঁর একটি মূল্যবান বই-এ (নিচে সংযোজিত সূত্র-তালিকা দ্রষ্টব্য) নিউটনের বিজ্ঞান-চিন্তা বিষয়ে খুবই ইঙ্গিতময় একটি মন্তব্য করেছেন : "নিউটনের বৌদ্ধিক আগ্রহের বিষয়গুলির ভিতরকার সম্পর্ক [ছিল] অত্যন্ত বিচিত্র। এইসব বিষয়ের সীমানা বিস্তৃত ছিল একদিকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের নানান অনন্য আবিষ্কার থেকে অপর দিকে কিমিয়াবিদ্যা (alchemy), ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ে নানান সস্তা (disreputable) কল্পভাবনা (আজকের নিরিখে) পর্যন্ত। তাঁর বৌদ্ধিক সৃষ্টিগুলির ওপর একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে কিছু অংশকে গ্রহণযোগ্য আর কিছু অংশকে বিস্মরণযোগ্য বলে রায় দিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা হতেই পারে। তবে, আমরা যদি নিউটনের মনের ভিতরকার বৌদ্ধিক সৃজনকার্যের প্রক্রিয়াটিকে ঠিকমত বুঝতে চাই তা হলে কিন্তু তাঁর ঐ সব সস্তা কল্পভাবনাগুলিকে ভুলে গেলে চলবে না। এই বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধির প্রচেষ্টায় দৈব উক্তিগুলি অথবা কিমিয়াবিদ্যা তাঁর কাছে ততটাই জরুরী ছিল, যতটা ছিল মহাকর্ষ বা অবকলনবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা। স্পষ্টতই, নিউটনের মনের ক্রিয়া [ঠিক] কি ধরনের ছিল, তা বোঝার ব্যাপারটা অনেকটাই বাকী রয়ে গেছে।" ('[ ]' বন্ধনীচিহ্নের প্রক্ষেপণ আমার)

এখানে রুয়েল যা বলতে চাইছেন তা হল, গণিতে বা অন্য কোন বিষয়ে সৃজিনীক্ষমতা অনেক সময়ই নির্ভর করে ব্যক্তির মনের গভীরে নিহিত নানান আপাত-অসংলগ্ন চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাসের উপর। গ্রোতেন্ডিকের গণিত-প্রতিভা আর তাঁর আধ্যাত্মিকতা, তাঁর 'ধ্যান', জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তাঁর নানান উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা, এ সবই কি বাঁধা ছিল একই সূত্রে, যার মূল প্রোথিত ছিল তাঁর অচেতন মানসলোকে?

গ্রোতেন্ডিক গণিতের জগৎটিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সম্ভবত এটাও বুঝেছিলেন, তাঁর নিজের গাণিতিক সৃষ্টিশীলতা তাঁর ঠিক 'হাতের' ব্যাপার নয়, এটার উৎস তাঁর অন্তর্লোকের এমন এক জগৎ যেখানে তিনি, বস্তুত, এক 'দর্শক' মাত্র। অথচ তিনি নিয়ে বসেছেন এমন এক বিশাল প্রকল্প, যা শেষ করা তাঁর 'হাতে' নেই। তিনি অনুভব করলেন এক অসহনীয় দায়বদ্ধতা যা ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত ও বিতশ্রদ্ধ করে তুলল তাঁর অস্থির মনকে। এই বিমূর্ত জগতের অধিবাসী হয়েই কি দিন কাটবে তাঁর? এই জগতের জন্যই কি আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁর বাবা? এই জগৎ কি তাঁকে দিতে পারবে বাবার লক্ষ্য সাধনের জন্য যে ভিন্ন পথ তিনি খুঁজে আসছেন তার সন্ধান? গণিতের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন গ্রোতেন্ডিক।

শুরু হল প্রতিবাদী আন্দোলন ও রাজনৈতিক চর্চা। কিন্তু এখানেও ঘটল আশা-ভঙ্গ। এখানেও ধাক্কা খেলেন গ্রোতেন্ডিক। যে মানুষ প্রতিবাদী আন্দোলন করে সে মানুষও কিন্তু 'শুদ্ধ' নয়। ক্ষমতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে, তার ভিতরও থেকে যায় ক্ষমতা-লিপ্সার বীজ, কারণ ক্ষমতার কোন সীমারেখা নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উৎসর্গীকৃত যে মানুষ, সেও মুখ ফিরিয়ে থাকে তার নিজের ও সতীর্থদের অসংখ্য ছোট-বড় অন্যায়ের দিক থেকে। শান্তির আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত মানুষ তার নিজের ভিতরই বয়ে নিয়ে চলে অশান্তির বীজ। এটাই জীবনের বাস্তবতা, এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সংগ্রাম, এবং এ ভাবেই প্রতিটি প্রতিবাদ ও সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে অমোঘ নিয়তির মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ক্ষমতা-আধিপত্য-অশান্তির নতুন কাঠামো। কোথায় পাবেন গ্রোতেন্ডিক এর বাইরে সেই পথ যার খোঁজে বাবার ফেলে যাওয়া মশাল হাতে উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ হেঁটেছেন তিনি? কোথায় সেই আশ্রয় যার সন্ধানে তৃষিত চাতকের মত এক বালিয়াড়ি থেকে এক বালিয়াড়িতে ছুটে বেড়িয়েছেন সারা জীবন ধরে?

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'শয়তান', ও অপ-নিয়তির চিন্তা অনেকটাই গ্রাস করেছিল গ্রোতেন্ডিকের উদভ্রান্ত মনকে, কারণ মানুষের ভিতর অমোঘ নিয়তির মতই তিনি দেখেছিলেন শয়তানের মুখ—'ধ্যান'-এর ভিতর বার বার বিশ্বজগতের বিধ্বংসী বিলোপের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তিনি, আর বার বার সেই ধ্যানেরই ভিতর আবার দেখতে চেয়েছেন মুক্তির সম্ভাবনা। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে তিনি খুঁজে বার করতে চেয়েছেন সেই সব 'অভিনব' মানুষদেরকে, যারা দেখাবে শান্তির পথ, শুদ্ধতার পথ। সে রকম আঠারো জন অভিনব মানুষের তালিকার ভিতর ছিলেন গান্ধীজী, ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস, ছিলেন জিড্ডু কৃষ্ণমুর্তি। আবার এরই পাশে শয়তানের অমোঘ অস্তিত্ব অনুভব করে বার বার আতঙ্কে আঁৎকে উঠেছেন তিনি। জানা নেই কোন অনুভূতি সঙ্গে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আলেকজান্ডার গ্রোতেন্ডিক—আজীবন যিনি হয়ে রইলেন মানুষের জগতে এক অচেনা আগন্তুক, যাঁর সম্পর্কে আগামী দিনেও প্রশ্ন উঠবে, কে এই গ্রোতেন্ডিক?

তথ্যসূত্র :

[গোড়াতেই উল্লেখ করেছি, গ্রোতেন্ডিক সম্পর্কে ব্যাপক ও বিশদ গবেষণা কিছু দিন হল শুরু হয়েছে। এর সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে গণিত সম্পর্কিত নানান আলোচনা, বিশ্লেষণ, ও মূল্যায়ন। তারই মাঝে শুরু হয়েছে এই রহস্যাবৃত মানুষটিকে ঘিরে নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা। নিচে যে সূত্রগুলির উল্লেখ করছি, সেগুলি থেকে আমি সামান্য যতটুকু বুঝেছি, তারই ভিত্তিতে লিখেছি এই নিবন্ধ। আমার মনে হয়েছে, গ্রোতেন্ডিককে বুঝতে হলে অনেক মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের, যা আজকের দিনে খুবই জরুরী। লিখতে গিয়ে আমার নিজের সামান্য কিছু অনুমান ও অনুভূতি যোগ হয়েছে

কোথাও। নিচে সব শেষে উল্লেখিত সূত্রটি গ্রোতেন্ডিকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়; তবে ডেভিড রুয়েল ছিলেন IHES-এ গ্রোতেন্ডিকের সহকর্মী; ৬ নং সূত্রে পাওয়া যাবে গ্রোতেন্ডিক সম্পর্কে রুয়েলের কিছু মূল্যবান স্মৃতিচারণ।]

1. Winfried Scharlau, "Who is Alexander Grothendieck?", *Notices of the AMS 55:8,* 930-941 (2008).
2. Winfried Scharlau, *Who is Alexander Grothendieck? Anarchy, Mathematics, Spirituality, Solitude : A Biography, Part 1 : Anarchy* (translated from the German by Melissa Schneps), Herstellung and Verlag : Books on Demand GmbH, Norderstedt Deutschland (2011).
3. Allyn Jackson, *"Comme Appelé du Néant-* As If Summoned from the Void : The Life of Alexandre Grothendieck" (in two parts), *Notices of the AMS, 51:9,* 1038-1056 (2004); *Notices of the AMS, 51:10,* 1196-1212 (2004).
4. Michael Artin, Allyn Jackson, David Mumford, and John Tate (Coordinating Editors), "Alexandre Grothendieck 1928-2014, Part 1", *Notices of the AMS, 63:3,* 241-255 (2016).
5. Michael Artin, Allyn Jackson, David Mumford, and John Tate (Coordinating Editors), "Alexandre Grothendieck 1928-2014, Part 2", *Notices of the AMS, 63:4,* 401-413 (2016).
6. David Ruelle, *The Mathematician's Brain,* Princeton University Press, Princeton (2007).
7. David Ruelle, *Chance and Chaos,* Princeton University Press, Princeton (1991).

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, মনীষা গ্রন্থালয়, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, অমর কোলে-র স্টল (বিবাদী বাগ)

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)

গ্রাহক চাঁদা— ১৮০ টাকা (ডাকখরচ সহ) কলকাতার বাইরে চেকের জন্য অতিরিক্ত ৩০ টাকা

পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমাজ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অমিত কান্তি সরকার

E-mail : sarkar.amit.1959@gmail.com

সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। একটা সময় ধারণা ছিল দেহাংশ, কিংবা কোষকলার বিকলতার ফলে অসুস্থতার জন্ম হয় এবং তা যে কারণে ঘটেছে তা দূর করতে পারলেই রোগমুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু শরীর ছাড়াও পরিবেশদূষণ, খারাপ আবাসন, অসাম্য, খাদ্য, অনিশ্চিতি, পরিশ্রুত জল ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলোও যে অসুস্থতার কারণ হতে পারে তা ক্রমশঃ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। অন্যান্য দেশে সেই অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি নির্ধারণ করা হলেও, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে চিকিৎসা পরিষেবা এখনও পুরোনো ধারণারই বশবর্তী। এর সাথে মুক্ত অর্থনীতি, কর্পোরেটে দুনিয়া তাদের মত করে অসুস্থতার সংজ্ঞা নিরূপণ ও সেই সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে, 'স্বাস্থ্যবাজার' তৈরি করছে। আমরা হয়ে পড়ছি নিছক 'উপভোক্তা'। মনোসামাজিক নানা সমস্যাও যে অসুস্থতার কারণ তা স্বাস্থ্যভাবনায় ভীষণ ভাবেই অনুপস্থিত থাকছে। ফলে, চিকিৎসাক্ষেত্রে সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সমগ্রবাদী দৃষ্টিতে পুরো বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিই, কেননা তা যুক্তিনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমাজ একই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু সত্যিই কি তাই!

মধ্যযুগে সমাজ, ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতো। মানুষ বিশ্বাস করত ঈশ্বর জ্ঞানের উৎস ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি যাজক কিংবা পুরোহিতদের মাধ্যমেই জ্ঞান আহরিত হয়। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ধর্মগ্রন্থে। প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে, প্রকৃতির অনিষ্ট সেকারণে অনৈতিক। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণাও এই বিশ্বাসেই পরিচালিত হ'ত। একজন মানুষ, স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে দৃষ্টি ও শ্রবণে যে অলীক বিশ্বাস কাজ করে, তা ধরে নেওয়া হ'ত দৈত্য বা অপদেবতার প্রভাবে ঘটেছে। তার ফলে চিকিৎসাবিধি নির্ধারিত হ'ত এইসকল অপবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে।

বায়োমেডিসিন : চিকিৎসা ভাবনা

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চিন্তা ভাবনায় এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে, যার প্রতিফলন সারা পৃথিবীতে পড়ে। এক্ষেত্রে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন রেনি দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), যাকে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর ভাবনা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রভাব ফেলে। তাঁর ধারণা ছিল শরীর জড়জগতের এবং মন আধ্যাত্মিক জগতের অংশ, উভয়ে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু পৃথক।

'বায়োমেডিসিন' চিকিৎসা ভাবনার এটা এক মাইলস্টোন। শরীর হল অসুস্থতার আধার, যা জড় জগতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই ধারণার ফলশ্রুতি হিসাবে রোগকে আর ঈশ্বরের ইচ্ছানির্ভর না ভেবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। সমাজে নূতন এক সামাজিক শক্তির উন্মেষ ঘটে, যা শুধু বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সময় চিন্তাবিদদের সকল চিন্তাভাবনায় প্রাধান্য পায় যুক্তিবাদ। ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কারের বিপ্রতীপে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা শুরু হয়। সেই সময়কার শরীরবিদেরা শরীরকে যন্ত্র হিসাবে কল্পনা শুরু করেন, যেখানে হার্ট হল পিস্টন, শিরা উপশিরা জলের নালি, পাকস্থলী হল পাত্র, পেশীশক্তি

হল উত্তোলক লিভার ইত্যাদি। বায়োমেডিসিন ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে চিকিৎসাবিজ্ঞান স্থান পায়। ল্যাবরেটরিতে ওই সংক্রান্ত গবেষণাও শুরু হতে থাকে। শিক্ষাপ্রাপ্ত এই চিকিৎসকরা তাদের সংগঠন তৈরি করে এবং তারাই নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যবিধি। ফলে প্রথাগত চিকিৎসক, দাই এরা সবাই ক্রমশ অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ল, আর চিকিৎসা পরিষেবা হয়ে পড়ল হাসপাতালকেন্দ্রিক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাক্তিকেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পেতে শুরু করল। স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে উঠল মূলতঃ দুজনের সম্পর্ককে ভিত্তি করে, যেখানে রোগী তার নিজের স্বাস্থ্য, অসুস্থতা নিয়ে উপস্থিত হবে পেশাগত দক্ষ চিকিৎসকের কাছে। সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের।

'Mind-body dualism'-এর ধারণা দেকার্তের ভাবনাপ্রসূত। তিনি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন, মনুষ্যপ্রকৃতি, তার চেতনা ও শরীর মনের সম্পর্ক। মস্তিষ্ক ও মন পরস্পর সম্পর্কিত, কিন্তু পৃথক। আমাদের ধারণা বিশ্বাস মূল্যবোধ, এগুলিকে বায়োলজিতে নামিয়ে আনা উচিত নয়। শরীর 'physical law' দ্বারা পরিচালিত হলেও মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'শরীর একটি যন্ত্র, অসুস্থতা কোন যন্ত্রাংশের বিকলতা', এই ভাবনায় আবেগ, মনন গুরুত্ব পেলেও তা অপ্রধান। রোগ নির্ধারণ, চিকিৎসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোগীর মতামত সেখানে প্রাধান্য পায় না। শরীরকে যন্ত্র ভাবার মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির কোন পার্থক্য থাকে না, গড়ে ওঠে এক সার্বজনীন চিকিৎসাবিধি। পরবর্তীতে কোন দেহাংশের বিকলতার ভাবনা থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে কোষকলার বিকলতাকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। কোন রোগের কারণ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট জীবাণুকে দায়ী করা শুরু হল। বাস্তবিক ক্ষেত্রে রোগের এই জীবাণুতত্ত্ব বসন্ত, কলেরা, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড এর মত বিভিন্ন মারণ রোগের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করলেও অন্য এক বিপত্তি ডেকে আনে। সমস্ত অসুস্থতার পেছনে একটিমাত্র কারণ খোঁজা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের অন্য শাখার মতো ওষুধ বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য মানবসভ্যতায় এমন এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল যেন সব সমস্যার সমাধান করতে সে সক্ষম। বাদ সাধল ১৯৪৫-এর হিরোশিমার বোমা বিস্ফোরণ। বিজ্ঞানের অন্য আবিষ্কারের মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানও প্রশ্নের সম্মুখীন হল। ওষুধের কুফল নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল যখন ১২ হাজার শিশু, অঙ্গহানি নিয়ে জন্মাল থ্যালিডোমাইডের প্রভাবে। নৈতিকতার প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হল এবং তা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা পেল। সকলের সর্বোত্তম মঙ্গল, বিজ্ঞানের এই এলিট ভাবনা প্রশ্নের সম্মুখীন হল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অসুস্থতার ধরণও গেল পাল্টে। জীবাণু ঘটিত মৃত্যুর প্রাধান্য খর্ব করে, তার জায়গা নিল ক্যান্সার, কার্ডিওভাস্কুলার রোগসমূহ। লাইফস্টাইল, স্ট্রেস বিভিন্ন রোগের অন্যতম কারণ হয়ে উঠল। অনুন্নত দেশগুলিতে সংক্রমণজনিত রোগ প্রাধান্য পেলেও উন্নত দেশগুলিতে বাড়তে থাকল ক্রনিক অসুস্থতা, বায়োমেডিকেল মডেলে যার ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়ে উঠল।

বায়োমেডিকেল মডেলের সীমাবদ্ধতা

অসুস্থতার বায়োমেডিকেল মডেল গত শতাব্দীতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য মনে হলেও বর্তমানে সব অসুখের ব্যাখ্যায় তা প্রশ্নাতীত থাকছে না, মূলত যে কারণে তা হল— সমস্ত রোগের পেছনে একটি নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, তা দূর করতে পারলেই সেই রোগটি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে এবং এই রোগমুক্তি তাকে সুস্থ করে তুলবে। বায়োমেডিকেল মডেলের খণ্ডাত্মক বিশ্লেষণে যে সাধারণ প্রশ্নগুলো উঠে আসে :

- অসুখ হল রোগের উপসর্গ অথবা রোগের কারণে শরীরের কোন অংশের গঠনগত কিংবা

কার্যগত অস্বাভাবিকতা।

- প্রত্যেক অসুখেরই উপসর্গ রয়েছে, অনেক সময় প্রথমে তা প্রকাশ নাও পেতে পারে। রোগের সাথে প্রত্যক্ষ যুক্ত নয় এমন অনেক কারণও রোগের অগ্রগতিতে প্রভাব ফেলে।
- স্বাস্থ্য হল অসুস্থতার অনুপস্থিতি।
- মানসিক ও আবেগজনিত বিভিন্ন কারণ শারীরিক অসুস্থতার সাথে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়।
- রোগীর পূর্বাপর কোন বিষয়কেই বিবেচনায় না এনে তাকে শুধু চিকিৎসা গ্রহীতা হিসেবেই গণ্য করা হয়।

বায়োমেডিকেল মডেলকে সহজভাবে প্রয়োগ করার ফলে সমাজের বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সমস্যা, পারস্পরিক জটিলতাও যে রোগের কারণ হয়ে ওঠে তা বিচার্য হল না। শরীরকে যন্ত্র ও উপসর্গকে দেহাংশ ঠিক মতো কাজ না করা, এই ভাবনার মধ্য দিয়ে উপসর্গ সারিয়ে তোলার প্রবণতা কাজ করে। তার ফলে রোগের মূল কারণ অধরাই থেকে যায়। শরীরের বাইরে যে সকল কারণ, যেমন দূষণ, নষ্ট প্রতিবেশ, খারাপ আবাসন, পারিবারিক নিগ্রহ, খাদ্য অনিশ্চিতি, পরিশ্রুত জল ইত্যাদি বিষয়গুলিও যে রোগের কারণ হতে পারে, তা বিবেচনায় আসে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র পরিশ্রুত জলই কোন জনসমষ্টির রোগ কমিয়ে আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে। সবসময় অসুস্থতা যে উপসর্গ নিয়েই আসবে এমন নাও হতে পারে; যেমন এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ ও উচ্চ রক্তচাপ, আবার উল্টোদিকে উপসর্গ থাকলেও তা আসলে রোগ নাও হতে পারে, যেমন ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম, মায়োএনসেফেলাইটিস। একসময় জীবাণুর বিরুদ্ধে ওষুধ আবিষ্কারকে যুগান্তকারী সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও, আজ আর তা বলা যাচ্ছে না, কেননা বর্তমানে অনেক এমন ওষুধ তার কার্যকারিতা হারিয়েছে।

অসুস্থতার সামাজিক নির্মাণ

স্বাস্থ্য এবং অসুস্থতা যে সামাজিক নির্মাণও হতে পারে, তা অনেক চিকিৎসকেরই মানতে অসুবিধা হয়। অনেকসময়ই কিছু রোগকে 'stigmatized' করা হয়। সাংস্কৃতিক নানা অনুষঙ্গ, অসুস্থতার এই সামাজিক নির্মাণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যেমন কুষ্ঠকে রোগ হিসাবে না ধরে ভাবা হয় কোন সময়ের পাপ কাজের ফল। চিকিৎসক দ্বারা অসুস্থ চিহ্নিত হওয়া মানুষের সামাজিক আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এপিলেপসি, এইচ. আই. ভি. এগুলির ক্ষেত্রেও অসুস্থ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের খারাপ আচরণের জন্য। মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে, অস্বাভাবিকতার সামাজিক নির্মাণ ব্যক্তিমানুষের স্বায়ত্বে বিঘ্ন ঘটায়, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অন্তরায় হয়ে ওঠে। একটা সময় মহিলাদের 'medically biological inferior' এই তকমা দিয়ে বাইরের জগতে মেলামেশা, পড়াশুনা ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে গেরস্থালির কাজে সীমাবদ্ধ রাখা হত। তার ফলে অনেক মহিলাই শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ত। সুস্থতার নিরিখে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, এই ধারণা সবসময়ই এক সামাজিক নির্মাণ।

চিকিৎসা ভাবনা : বায়ো সাইকো সোশ্যাল মডেল

এই ভাবনার প্রবক্তা মনোচিকিৎসক জর্জ এঞ্জেল। তার ধারণা স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার মধ্যে সীমারেখা টানা খুব কঠিন, 'the focus of this bio psychosocial practice would be not just a body in need of repair but a thinking, feeling, social being, that is a being with a biological, a psychological and social self'। সামাজিক বিভিন্ন অনুষঙ্গ, শ্রেণী, বয়স, বর্ণ, পঙ্গুত্ব, যৌনতা এই সব নিয়েই চিকিৎসার সামাজিক মডেল গড়ে উঠেছে। আমাদের চারপাশে যারা আছে

শুধু তাদের নিয়েই সমাজজীবন তৈরি হয় না, যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমাজ গড়ে ওঠে সেটাও বিবেচনায় আসা উচিত। শুধুমাত্র রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে নয় রোগ নিবারণের ক্ষেত্রেও 'social model' কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। একজন সাধারণ মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার পছন্দ, আকাঙ্খার পরিসর খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক। সেকারণে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেবলমাত্র নিরাময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, পাশাপাশি নিয়মিত সুস্থ থাকা, রোগের পরে পুনর্বাসন, সামাজিক সম্পর্ক, এই সব কিছুকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

রোগ, চিকিৎসা, তথ্য : সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

বর্তমানে সাধারণ মানুষ (lay person) রোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষজ্ঞ ও অবিশেষজ্ঞের মধ্যেকার প্রাচীর আর আগের মত নেই। একজন 'lay person' ও তার অসুস্থতা, চিকিৎসাবিধি, ওষুধের গুণাগুণ, চিকিৎসা সম্ভাবনা সবই জানতে পারছে এবং চিকিৎসককে সেই সংক্রান্ত প্রশ্নও করছে, যার ফলে চিকিৎসকসমাজ পেশাগত বিপন্নতায় ভুগছে। বর্তমানে চিকিৎসা পরিষেবায় সাধারণ মানুষ (lay person)-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইন্টারনেট ও বিভিন্ন মাধ্যমের মারফত রোগ, রোগের ভবিষ্যৎ, পরীক্ষা নিরীক্ষা, চিকিৎসাবিধি, ওষুধের গুণাগুণ, সব সম্পর্কেই সে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠছে। এর ফলে 'Medical Power' কোন একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকছে না, সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ছে। ই-ফার্মাসির দৌলতে নিজের চিকিৎসা নিজেই করছে এমনকি অন্যের চিকিৎসারও নিদান দিচ্ছে। ওষুধ কোম্পানির দেওয়া চিকিৎসা পরিষেবার এই 'Manufactured Information' এবং তাতে সাধারণ মানুষের অবাধ অভিগমনের ফলে শুধু চিকিৎসককুলই যে বিপন্ন হচ্ছে এমনটি নয় পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ও অনিয়ন্ত্রিত ওষুধের ব্যবহার শরীরের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করছে।

তথ্য নির্ভর চিকিৎসা পরিষেবা

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষজন তাদের মত করে সামাজিক বাতাবরণ তৈরী করছে, তারা শুধু রোগী থাকছে না হয়ে উঠছে স্বাস্থ্য পরিষেবার একজন ক্রেতা। তথ্যে সমৃদ্ধ একজন অসুস্থ মানুষ তার ধারণা, অধিকার নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসছে, একজন উপভোক্তা হিসাবে চিকিৎসা পরিষেবার ভাল মন্দ বুঝে নিতে চাইছে, চিকিৎসকের সাথে 'negotiate' করছে, অন্যথা হলে আইন আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে। 'Doctor knows best' এই ধারণা, ওষুধ চিকিৎসার রহস্যময়তাও আজ আর নেই। তার ফলে রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষ কি ভাবছে, কি বুঝছে, কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে সবই 'Mainstream Medicine'-এর অংশ হয়ে উঠছে। এসবই নিয়ন্ত্রণ করছে ওষুধ কোম্পানি, কর্পোরেট দুনিয়া এবং নির্ধারিত হচ্ছে নানা স্বাস্থ্যবিধি।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ক্ষমতা

আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের দ্বন্দ্ব দেখতে পাই, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, চাকুরিস্থল, সব জায়গাতেই। অন্যের অভ্যাস, রুচিপ্রকৃতি, মতামত ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে সামাজিক স্তরের ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রকাশ ঘটে। শিক্ষকের ছাত্রদের ওপর ক্লাসরুমে কর্তৃত্ব নেওয়া, পুলিশ মিলিটারির জনতার ওপর কর্তৃত্ব নেওয়ার মতই চিকিৎসক তার অধিগত জ্ঞান দ্বারা রোগীর ওপরে কর্তৃত্ব নেন। একজন চাকুরিজীবী নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হবে যাতে কাজে সক্ষম থাকতে পারে, নিয়মিত অফিসে আসতে পারে। এটাই দস্তুর! কিন্তু কোন ব্যক্তির এই 'social value' চিকিৎসক দ্বারা মূল্যায়িত হওয়ার ফলে মানুষটি তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে, অনেক সময় অসুস্থ হলে 'sick role'

এর ভূমিকা পালন করে। অতএব সেই মানুষটির দায়িত্ব থাকছে সুস্থ হয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা। চিকিৎসক হলেন সেই 'Gate keeper' যিনি তা নির্ধারণ করবেন। সমাজে এই 'sick role' অনেকক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি থাকা ইত্যাদি তার ব্যক্তিজীবনে এমন পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে শ্রমিক শ্রেণীকে কর্মক্ষম রাখতে যাতে উৎপাদন অব্যাহত থাকে, এই ভাবনা থেকে ও পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর চাপে রাষ্ট্রকে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা ভাবতে হয়েছিল। এখন যখন বেশীরভাগ দেশগুলি ঋণভারে জর্জরিত, জাতীয় আয়ের বেশীরভাগটাই ব্যয়িত হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ মেটাতে ফলে দারিদ্র দূরীকরণ কার্যত অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। খাদ্য অনিশ্চিতি ও অসাম্য, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া, টিবি, অপুষ্টিজনিত শিশু মৃত্যু ডেকে আনছে। অথচ পুঁজি থেমে থাকছে না, স্বাস্থ্য পরিষেবায় লগ্নি হচ্ছে, ওষুধ কোম্পানি, বীমা কোম্পানি, নানাবিধ লিগ্যাল ফার্ম লাভের আশায় মুক্ত বাজারে নেমে পড়েছে। তারা তাদের মত করে ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্র প্রসারণ

ইভান ইলিচ তাঁর 'Limits to Medicine' বইতে বলেছেন হেলথ কেয়ার বস্তুত 'Good Health'-এর প্রতিবন্ধক। তাঁর মতে চিকিৎসাক্ষেত্রে ওষুধ ও প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার রোগ নিরাময় করার থেকে বেশীমাত্রায় অসুস্থতা তৈরি করছে। এটা সর্বজনবিদিত, চল্লিশের দশকে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার রোগ নির্মূলে এক যুগান্তকারী ঘটনা, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তা আজ কার্যকারিতা হারিয়েছে, এমনকি অনেকক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থা 'Medically Sponsored Behaviour' তৈরি করছে যার ফলে একজন মানুষের স্বায়ত্ত বিঘ্নিত হচ্ছে, পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণ নষ্ট হচ্ছে। 'Medicalisation'এর ফলে অনেক 'নন-মেডিকেল' বিষয়কে মেডিকেল বিষয় করে তোলা হচ্ছে। আগে যে শিশু 'দুষ্টু' ছিল এখন সে হয়ে পড়ছে Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) এবং তার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে 'রিটালিন' ওষুধ। ঠিক একই ভাবে 'Insomnia, Sadness, Shyness, Sexuality, Obesity, Baldness, Hairyness, Learning Disability, Teenage misbehavior' সবকিছুই হয়ে পড়ছে অসুস্থতা এবং তা নিবারণ করতে নির্ধারিত হচ্ছে ওষুধ কিংবা শল্যচিকিৎসা। সামাজিক, নৈতিক, আইনগত বিভিন্ন রায় চিকিৎসার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে। দেখা গেছে মানসিক স্বাস্থ্য, অর্থাৎ 'সুস্থ স্বাভাবিক না পাগল' এই ধরণের বিষয় অনেক সময়ই রায়কে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক সমাজে নিজস্ব কিছু নিয়মবিধি, ধারণা বিশ্বাস রয়েছে, যে মন কি ধরণের খাবার খেলে ভাল থাকা যাবে, যৌন আচরণ কেমন হওয়া উচিত; কিন্তু আধুনিক সমাজে সামাজিক এই সকল আচরণবিধিকেই একটি সাধারণ নিয়মে বেঁধে ফেলা হচ্ছে এবং যার নজরদারিতে থাকছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। মিশেল ফুকো যাকে 'surveillance' বলেছেন। একজন চিকিৎসক সাধারণ মানব শরীর ও রোগকে কিভাবে দেখবে এবং সাধারণ মানুষ কিভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হবে ও গ্রহণ করবে, যাকে আমরা 'Medical Gaze' বলতে পারি এটা যে শুধু চিকিৎসক দ্বারা ওপর থেকে নীচে কাজ করে এমনটি নয়, তা সমাজের প্রতিটি স্তরে নেটওয়ার্ক এর মত কাজ করে, এই 'Medical Discourse' এ সবাই অংশগ্রহণ করছে। প্রত্যেক দিনের দাঁত মাজা, টয়লেট যাওয়া থেকে সারাদিনের নানা অভ্যেস, রাতে শুতে যাওয়া সবকিছুই স্বাস্থ্যবিধির নিয়মাধীন হয়ে পড়ে। আর ভাল থাকাকে

নিশ্চিত করতে চালু হয় বিভিন্ন স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম যেমন শরীরে মেদ জমলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা, উচ্চ রক্তচাপে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এর ফলে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে পড়ে 'Presymptomatic'। সমীক্ষা বলছে, এক নতুন শ্রেণীর রোগীর (Worried Well) উদ্ভব হয়েছে, যাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানকালে একগুচ্ছের জেনেটিক পরীক্ষা বাজারে এসেছে, যারা দাবি করছে এর মাধ্যমে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, কার্ডিওভাস্কুলার রোগ ইত্যাদির সম্ভাবনা নির্ধারণ সম্ভব। সকলের ভাল থাকার, সুস্থ থাকার, এই অদম্য হিড়িক যেন 'Eugenic Movement'-এর এক নব্যরূপ!

পরিকথা

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মডেলের বিবর্তনের ফলে 'Biopsychosocial Model' তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র 'স্বাস্থ্য' সংজ্ঞায় শারীরিক ভালো থাকার পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিক ভাল থাকাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিষেবায় এই মডেল ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কেননা রোগের ধরণ গেছে পাল্টে এবং তার কারণ হিসেবে পরিবেশ, দারিদ্র, লাইফ স্টাইল, মনোসামাজিক নানা সমস্যা সামনে এসে পড়ছে। বাস্তব, সত্য এসব কিন্তু ভিন্নতর। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় বায়োমেডিকেল মডেলের অন্ধ প্রয়োগ করা হয়, আর তা ঘিরেই রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক, চিকিৎসা ব্যবস্থা-অব্যবস্থা, সব কিছুই আবর্তিত হচ্ছে। এছাড়া পরিকল্পিতভাবে সমাজকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে, ফলে সামাজিক ভাল থাকা এখন এক অলীক কল্পনা। মনোসামাজিক নানা সমস্যা ঘিরে যে অসুস্থতা, নষ্ট হওয়া সামাজিক পরিসরে তা দূর করা শুধু কথার কথা।

তথ্যসূত্র :

1. Synott, A. (1993) *The Body Social, Symbolism. Self and Society.* London: Routledge.
2. Gabe, J., Bury, M and Elston, M.A. (2004) *Key Concepts in Medical Sociology.* London: SAGE.
3. Seymour, W. (1998) *Remaking the Body, Rehabilitation and Change.* London: Routledge.
4. Nettleton, S (2006) *The Sociology of Health and Illness,* Second Edition, Cambridge: Polity.
5. Russell, L. (2014) *Sociology for Health* Professionals. London: SAGE Publications Ltd.
6. Engel, G. L. (1977) 'The need for a new medical model: a challenge for biomedicine', *Science*, 196, 2486, 8th April: 126–36.
7. Gramsci, A. (1971) *The Prison Notebooks.* London: Lawrence and Wishart.
8. Zola, I. K. (1972) 'Medicine as an instituttion of social control', in C. Cox and A, Mead (eds) (1975) *A Sociology of Medical Practice.* London: Collier–Macmillan, 170–85.
9. Navarro. V. (1976) *Medicine Under Capitalism.* London: Croom Helm.
10. Illich, I. (1976) *Limits to Medicine, Medical Nemesis: The Appropriation of Health.* London: Marion Boyars.
11. Royal Society of Public Health (2005) 'The worried well: is health promotion to blame?' *Journal of the Royal Society for the Promotion of Public Health*, 125(2): 51.
12. Chinn, D. (2011) 'Critical health literacy : a review and critical analysis', *Cocail Science and Medicine*, 73 (1):60–67.
13. Davies, J. and Davies, D. (2010) 'Origin and evolution of antibiotic resistance'

Microbiology and Moleculaur Biology Review, 74(3):417–33.

14. Rafalovich, A. (2013) 'Attention Deficit—Hyperactivity Disorder as the medicalization of childhood: challenges from and for sociology', *Sociology Compass*, 7(5):343–54.
15. Foucault, M. (1977) *Discipline and Punish.* Harmondsworth:Penguin
16. Peterson, A. and Bunton R. (1977) *Foucault, Health and Medicine.* London: Routledge.
17. Conrad, P. and Barker K. (2010) 'The Social Construction of illness: Key Insights and Policy Implication' *Journal of Health and Social Behaviour.* 51:67–79.
18. Sartorius, N. (2007). 'Stigmatized Illness and Health Care', *The Croatian Medical Journal*, 20, 48(3):396–97.

ভিন্ন স্বাদের কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

✦ নিউক্লিয়ার বোমা নয় ✦ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা
✦ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ✦ পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাণ ✦ পরিবেশ
✦ আইন-কানুন ✦ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ✦ বিজ্ঞান সমাজ মানুষ ✦ পরিবেশবিদ্যা পরিচয়
✦ পরমাণু শক্তি নয়—বিকল্প শক্তিই ভরসা ✦ ভারতের আম আদমির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
✦ বিজ্ঞানে আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণ ও নির্মাণ : রবীন মজুমদার

পাওয়া যাবে দু'হাজার উনিশের বইমেলায় বি-ও-বির টেবিলে ও অন্যত্র।

বি-ও-বি-তে আপনার মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য
ডাকযোগে এবং / অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা, ২/১এ, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

দশ বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে

দুর্বার ভাবনা

১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬, ফোন : ০৩৩ ২৫৪৩৭৫৬০/৭৪৫১
ই-মেল : tarunbasu2006@gmail/com, URL : www.durbar.org

ধানক্ষেতে রোগ পোকার উপদ্রব বৃদ্ধি : একটি বাস্তুতান্ত্রিক অনুসন্ধান

অভ্র চক্রবর্ত্তী
E-mail : abhrachakrabarti@gmail.com

সবুজ বিপ্লবের পর ধানক্ষেতে ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেড়েছে প্রায় ৫০০%, সবুজ বিপ্লবের পর উচ্চফলনশীল ধান চাষ শুরু হবার ফলে কৃষি বাস্তুতন্ত্রে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলেই রোগ পোকার এই ভয়াবহ উপদ্রব বৃদ্ধি। খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি আমাদের সহ্য করতেই হবে, নাকি অন্য কোনো উপায় ও আছে? এই নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার সার সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের গ্রামে ধানচাষের মরসুম আসার সাথে সাথে নানান কোম্পানীর হরেক রকম পোকা মারা বিষের বিজ্ঞাপনে হাট-বাজার ছেয়ে যায়। চাষীর সবচেয়ে ভয় বাদামী শোষককে, তাই বাদামী শোষক মারা বিষের বিজ্ঞাপনই সবচেয়ে বেশী। চাষীরা অবশ্য এগুলিকে বিষ বলেন না। কোম্পানী তাদের যেমন শিখিয়েছে সেই মত তারা দোকানে গিয়ে পোকামারা "ওষুধ" খোঁজেন। এই ছবি শুধু আমাদের গ্রামের নয়, দেশের অধিকাংশ গ্রামেরই এই চেহারা। চাষী তার অভিজ্ঞতা থেকে এটাও বুঝছেন যে এত "ওষুধ" দিয়েও রোগ পোকা কিন্তু আটকানো যাচ্ছে না। ১৯৬০-এর দশকে ধানক্ষেতে যে পরিমাণ বিষ ব্যবহার করা হ'ত আজ তার প্রায় দশ গুণ হয়। তৎসত্ত্বেও পোকার উপদ্রব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ধানক্ষেতে দু তিন বার করে বিষ দিয়েও অনেক সময় বাদামী শোষকের মহামারি আটকানো যাচ্ছে না। চুচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ড. পুলক বেড়ার একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে উচ্চফলনশীল ধানচাষ শুরু হবার পর থেকে ২৬ রকমের পোকা ধানের ক্ষতিকর পোকা হিসাবে দেখা দিয়েছে যাদের আগে ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে ধানক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়েছে ৫০০% (Krishnaiah, K. & Varma, N. R. G. 2011)। যে বাদামী শোষক চাষীর ঘুম কেড়ে নিয়েছে, ১৯৭৫ সালের আগে সেটা আদৌ ধানের ক্ষতিকারক পোকা ছিল না, এবং ১৯৯৫ সালের আগে পর্যন্ত তার ক্ষতি করার ক্ষমতা ছিলো সামান্যই। ধানক্ষেতে রোগ পোকার এই বে-বলগা উপদ্রব বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করার জন্য বেশ কিছু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। এখানে সে সব গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির আলোকে ধানক্ষেতে রোগ পোকার উপদ্রব বৃদ্ধির সাথে ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্রের সম্পর্ক কি এবং এই পোকার উপদ্রব কমানোর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি তা আলোচনা করা হয়েছে।

ধানক্ষেতের জীব-বৈচিত্র্য

আজ থেকে প্রায় ৮০০০ বছর আগে চীন দেশে ধান চাষের সূচনা হয়েছিল। ভারতে ধান চাষের সূচনা হয়েছে প্রায় ৫০০০ বছর আগে (Gross and Zhao 2014)। বহু রকমের আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেও ধান মূলতঃ জলা জমির ফসল। সুদীর্ঘকাল ধরে জলা জমিতে ধান চাষ হবার কারণে জল জমা ধানক্ষেতে এক সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে। ধানক্ষেতে যে বিপুল জীব-বৈচিত্র্য দেখা যায় তার সাথে ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্যের তুলনা করা চলে। Settle এবং তার সহযোগীরা ১৯৯৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা ধান জমিতে সমীক্ষা করে ৭৬৫ রকম প্রজাতির পোকা এবং মাকড়সার সন্ধান পেয়েছিলেন। থাইল্যাণ্ডের একটি ধানক্ষেতে ৫৮৯টি প্রজাতির জীবের সন্ধান পাওয়া

গেছিল যাদের মধ্যে ২৩৩টি অমেরুদণ্ডী। সেখানে ছিল ১৮টি প্রজাতির মাছ ও ১০ রকম বিভিন্ন প্রজাতির উভচর ও সরিসৃপ (Heckman 1979)। এ ছাড়াও ধানক্ষেতে দেখা যায় বক, শামুকখোর, ফিঙে, বাবুই, প্যাঁচা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, জৈব ধানক্ষেতে পাখি ধানগাছ দিয়ে বাসা তৈরি করে এমনও দেখেছি, কিন্তু সে পাখি ধান খায় না। যে ধান গাছগুলো দিয়ে বাসাটা তৈরি হয়েছে তাতে ধান ফলতেও অসুবিধা হয় না। ধানক্ষেতের আলে ছোটো বড় মেঠো ইঁদুর জাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাসা করে থাকে। এই বহু বিচিত্র প্রজাতির জীব একে অপরের সাথে নানান স্তরের খাদ্য-খাদক সম্পর্কে যুক্ত, এর থেকে বোঝা যায় ধানক্ষেতের খাদ্যজাল কি পরিমাণ জটিল। ধানক্ষেতের এই জটিল খাদ্যজালের কারণে বহু পোকাই ধানের ক্ষতিকর পোকা বা পেষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। কেবল রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ আর কীটনাশক বিষ দিয়ে পোকা মারার হুজুগে এই জটিল খাদ্যজাল নির্বিচারে ধ্বংস করে আরও বড় বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। সেই কথা সবিস্তারে এবার আলোচনা করা হবে।

খাদ্যজাল ও পেষ্ট নিয়ন্ত্রণ

ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্র ও পেষ্টের (মূলতঃ বাদামী শোষক পোকার) উত্থানের সম্পর্ক নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন William Settle ও তার সহকর্মীবৃন্দ। তারা ধানক্ষেতে যে ৭৬৫ রকম পোকা -মাকড়ের সন্ধান পেয়েছিলেন তাদের চারটি গোষ্ঠিতে ভাগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ১২৭টি শাকাশি প্রজাতি, ১৪৫টি প্রজাতির খাদ্য ছিলো প্ল্যাঙ্কটন আর পচনশীল জৈব পদার্থ, ১৮৭টি ছিল পরজীবী আর ৩০৮টি ছিল মাংসাশী। শাকাশি প্রজাতিগুলির মধ্যেই কোনো কোনোটা ধানের ক্ষতিকর পোকা বা পেষ্ট হয়ে ওঠে কারণ তারা ব্যাপক হারে ধানগাছের বিভিন্ন অংশ খেয়ে ফেলে ফলনের ক্ষতি করে দেয়। অন্যদিকে পরজীবী আর মাংসাশীদের বন্ধু পোকা বলা হয়, কারণ তারা শাকাশিদের শরীরে রোগ সৃষ্টি করে বা তাদের খেয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণে রাখে। দেখা যাচ্ছে যে কিটনাশক বিষ ব্যবহার না করলে এবং জৈব সার ব্যবহার করলে এই পরজীবী আর মাংসাশীদের সংখ্যা শাকাশিদের প্রায় ৪ গুণ থাকে। ধানজমির মাটিতে জৈব সার যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে জল জমার পর সেখানে প্রচুর পরিমাণে Zoo Plankton বা প্রাণীকণা তৈরি হয়, তাই প্ল্যাঙ্কটন আর পচনশীল জৈব পদার্থ যে সব পোকারা খায় তাদের প্রচুর বাড়-বাড়ন্ত ঘটে। এইসব পোকাদের খায় মাংসাশীরা, ফলে তারাও সংখ্যায় বাড়ে। তাই ধান রোয়ার একেবারে শুরুর থেকেই মাংসাশী পোকা-মাকড়ের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি থাকে। পেষ্টদের আগমন ঘটে একটু পরে। ধান গাছ একটু বড় হলে পাতাখেকো পোকা আর কাণ্ডে ফুটো করা পোকারা আসে, তারপর ফুল ফুটলে আরও কিছু পোকা আসে, এদের মধ্যে কেউ কেউ ধানের রস চুষে খায়। কিন্তু এরা যখন আসে তার আগে থেকেই ধানক্ষেতে মাংসাশী পোকাদের সংখ্যা এত বেশি থাকে যে তাদের দাপটে এই পেষ্টদের সংখ্যা খুব একটা বাড়তে পারেনা। ধানক্ষেতে যে ব্যাঙ, গিরিগিটি প্রভৃতি প্রাণীরা থাকে তারাও অনেক পোকা খেয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ফিঙে, প্যাঁচা এই সব পাখিরাও পোকা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সাপ এবং প্যাঁচা ইঁদুর জাতীয় স্তন্যপায়ীদের খেয়ে ফেলে। এইসব মাংসাশী সরিসৃপ ও পাখির উপস্থিতির কারণে ইঁদুররা যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে থাকে, ফলে তাদের প্রজনন হার খুব কম হয়। লক্ষ্মীপ্যাঁচা এক নিপুন শিকারি। প্রজনন ঋতুতে একজোড়া লক্ষ্মীপ্যাঁচা প্রায় ৫০০০ হাজার ইঁদুর শিকার করে (Alex Keene 2009)। তাই ধানক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে লক্ষ্মীপ্যাঁচা বিশেষ ভূমিকা নেয়। ধানক্ষেতের মাছ শুধু প্রোটিনের ভাল উৎসই নয় পেষ্ট নিধনেও খুবই উপযোগী। চীনে জল জমা

ধানক্ষেতে মাছচাষ সংক্রান্ত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ধানক্ষেতে মাছের সক্রিয়তা সাধারণ পুকুরের মাছের থেকে বেশি। ধানক্ষেতে মাছ মাঝে মাঝেই ধান গাছে ধাক্কা মারে। এই ধাক্কার চোটে ধান গাছের অনেক পোকা ছিটকে জলে পড়ে এবং মাংসাশী মাছেরা তাদের খেয়ে ফেলে। দেখা গেছে যে এই ভাবে ধানক্ষেতে মাছ প্রায় ৬৮% পোকার আক্রমণ কমায় (Jian Xie et. al. 2011)।

বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ও পেস্টের উত্থান

সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে আমাদের দেশে ধানের ফলন বাড়াবার জন্য বেঁটে জাতের উচ্চফলনশীল (HYV) ধান চাষ শুরু হয়। এদের মধ্যে sd1 নামক একটি জীন থাকায় জিব্বারেলিন নামক এক ধরনের উদ্ভিদ হরমোন তৈরি হতে পারে না। জিব্বারেলিন হরমোন উদ্ভিদের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ ভাবে দায়ী। এই হরমোনের অভাবে এরা খর্বাকৃতি হয় (Ashikari M et.al 2002)। sd1 জীন থাকার কারণে প্রচুর রাসায়নিক সার প্রয়োগেও এরা খুব একটা লম্বা হয় না ফলে ঢলে পড়ে যায় না এবং অতিরিক্ত পুষ্টি পদার্থকে দানার ওজন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এই বেঁটে জাতগুলির কাণ্ডে লিগনিন নামে-একধরনের কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থের সঞ্চয় খুব কম হয় (Okuno et al., 2014)।

লিগনিন কাণ্ডকে দৃঢ়তা দেয়, তাই লিগনিন কম থাকার কারণে এই ধরনের ধান গাছের কাণ্ডে সহজেই পোকারা ছিদ্র করতে পারে। HYV ধানের অঙ্গস্থানিক, শারীরবৃত্তিয়, এবং জেনেটিক চরিত্র রোগ পোকার উপদ্রব বৃদ্ধির জন্য দায়ী (Bera, P. K., 1996)। ধানের অধিকাংশ রোগ পোকা প্রতিরোধী জিনই আছে *indica* উপ-প্রজাতির দেশী ধানে (Keizi Kiritani

তালিকা-১ : রোগ পোকা প্রতিরোধী দেশীয় ধান

রোগ পোকার নাম	রোগ পোকা প্রতিরোধী দেশীয় ধানের ভ্যারাইটির নাম
Green Leaf Hopper	গোপালভোগ
Bacterial Leaf Blight	আসানলিয়া, তিলককাছারি, কুমারগোর, ভাসামানিক
Case Worm	বাঁশকাটি, হলুদগেটি, ষাটিয়া
Leaf Folder	ভুঁড়ি, দুধকলমা, ডুমুরকান্দি
Gall Midge	দ্বারকাসাল
Brown Plant Hopper	যুগল
Sheath Blight	তিলককাছারি, কুমারগোর, ভাসামানিক
Rice Tungro Virus	তিলককাছারি, কুমারগোর, ভাসামানিক
Blast	তিলককাছারি, কুমারগোর, ভাসামানিক, সবিতা

উৎস ঃ P. K. Rice Research Station, Chinsura, Dist. Hooghly, West Bengal : Change in pest scenario after HYV introduction in West Bengal (Proceedings of Workshop on *Conservation and Community Copyrights of Folk Crop Varieties.* WWF-India. Kolkata 1996 & Deb, D., Seeds of tradition seeds of future, Folk rice varieties of Eastern India. RFSTE, New Delhi 2005

1979)। মুগদো নামক একটি দেশী ধান বাদামী শোষক পোকার বিরুদ্ধে উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল (Kazushige Sogawa and Pathak M.D. 1970)। এখনও পাওয়া যায় এমন কয়েকটি রোগ পোকা প্রতিরোধী দেশী ধানের উল্লেখ তালিকা ১-এ করা হল।

সবুজ বিপ্লবের পর এই সব দেশীয় ধানের চাষ ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল। হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে সারা বছর ধরে কয়েকটি মাত্র HYV র চাষ চলতে থাকল যাদের কোষে ধানের এই বহু বিচিত্র পেষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধী জীন ছিল না। তাছাড়া এই ধানগুলি আমন এবং বোরো উভয় মরশুমেই চাষ করা যায়। এই সময় রাষ্ট্রের কৃষিনীতিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল, তাই স্থানীয় শস্য বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব না দিয়ে একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে ধানের পর ধান বা ধানের পর গম চাষ শুরু হয়। HYV এর চাষ বাড়ার সাথে সাথে দেশীয় জাতগুলির চাষ দ্রুত কমতে থাকল। ধান বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা এক বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই দেশী জাত চাষ বন্ধ হবার ফলে জাতগুলি দ্রুত অবলুপ্ত হতে শুরু করল। অনুমান করা হয় সবুজ বিপ্লব আসার আগে ভারতে লক্ষাধিক দেশী ধানের জাত ছিল, আজ খুঁজলে দু হাজারটিও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভারতে মোট ধান উৎপাদনের ৯০% আসে মুষ্টিমেয় কয়েকটি HYV থেকে। HYV গুলিতে দানা এবং খড় প্রায় সমান সমান হয়, অপরদিকে দেশি ধানে দানা ও খড়ের ওজনের অনুপাত ১:৪ থেকে ১:৫, HYV চাষে খড়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়, ফলে গবাদি পশুর খাদ্য বা মালচিং (আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সুবিধার জন্য মাটি ঢেকে রাখা) এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটে। সবুজ বিপ্লবের আগে রবি ও প্রাক খারিফে ডাল শস্যের চাষ হোতো, ডালের ভুষাও গবাদী পশুর গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ছিলো, তার জোগানও কমতে থাকল। একদিকে গবাদী পশুর খাদ্যের জোগান কমে যাওয়া, অন্যদিকে চাষের কাজে হাল বলদ, গোরুর গাড়ি ইত্যাদির পরিবর্তে ট্রাকটরের ব্যবহার বাড়া, এর সম্মিলিত প্রভাবে চাষিদের মধ্যে গোরু পোষার রেওয়াজ কমতে থাকে। ফলে জমিতে জৈব সারের ব্যবহারও কমতে থাকে। জলমগ্ন ধান জমিতে জৈব পদার্থ কম থাকলে যথেষ্ট পরিমাণে Zoo Plankton তৈরি হয় না, যে পোকারা প্ল্যাঙ্কটন অথবা পচনশীল জৈব পদার্থ খায় তাদের সংখ্যা তেমন বাড়ে না, ফলে তাদের যে মাংসাশীরা খায় তাদের সংখ্যাও বাড়ে না। এই পরিস্থিতিতে যখন ধানক্ষেতে পেষ্টের আক্রমণ ঘটে তখন তাদের খেয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট মাংসাশী পোকা উপস্থিত থাকে না। পেষ্টদের খাবার জন্য যখন মাংসাশীরা আসতে শুরু করে তার মধ্যেই পেষ্টরা ধানের ভালো রকম ক্ষতি করে দেয়। এই কারণেই এমন অনেক পোকা পেষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যাদের আগে বিশেষ ক্ষতি করার ক্ষমতা ছিল না। জৈব সারের ব্যবহার কমা এবং HYV-তে পেষ্ট প্রতিরোধী জীন না থাকা এই দুই এর মিলিত প্রভাবে ধানক্ষেতে রোগ পোকার আক্রমণ অনেকটাই বাড়ে। অবস্থা সামাল দেবার জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা কীটনাশক বিষ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এই বিষ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। বিষের প্রভাবে যেমন পেষ্টরা মারা পড়ে তেমনি অন্যান্য পোকা যেমন যারা প্ল্যাঙ্কটন বা পচনশীল জৈব পদার্থ খায়, যারা মাংসাশী, তারাও মারা পড়ে। পেষ্টদের অন্যান্য প্রাকৃতিক শত্রু যেমন ব্যাঙ, মাছ গিরগিটি, পাখি, তারাও মারা পড়ে। পোকা মারা বিষের প্রভাবে সব পোকা মরে না কেউ কেউ আধমরা হয়েও বেঁচে থাকে। তাদের শরীরে ওই বিষ অল্প পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। আবার পোকারা খুব দ্রুত বিভিন্ন বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। র‍্যাচেল কারসনের লেখা বিখ্যাত বই 'দি সাইলেন্ট স্প্রিং' থেকে জানতে পারছি যে ১৯৮৫

সালের মধ্যেই প্রায় সাড়ে চারশো রকমের পোকা বিভিন্ন বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে উঠেছিল। এই সব পোকাদের শরীরে বিষ ঢুকবে কিন্তু তারা মরবে না। কিন্তু কোন ব্যাঙ বা গিরগিটি যদি এরকম ১০০টি পোকা খায়, তাহলে এই ১০০ পোকার দেহে সঞ্চিত বিষ তার দেহে ঢুকবে এবং সেটি মরে যাবে। মাছেরা খুব সামান্য পরিমাণে কীটনাশক বিষেও মারা পড়ে, কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে ধানক্ষেতের মাছ বিলুপ্ত হতে থাকে। এর সামগ্রিক ফল হিসাবে ধানক্ষেতে পেস্টের আক্রমণ হু হু করে বাড়তে থাকে, প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করেও যা আর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

পেস্টের উত্থান কি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অনিবার্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া?

এরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে দেশী ধানের ফলন তথাকথিত HYV-র থেকে অনেক কম, তাই প্রচুর সার আর কীটনাশক দিয়ে HYV-র চাষ করতে না পারলে আমাদের দেশের ১০০ কোটির বেশি মানুষকে খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ তথ্য আলোচনা করব এবং তার আলোকে বোঝার চেষ্টা করব যে এই প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে কতটা সত্য আছে।

কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ঃ অত্যন্ত প্রামাণিক ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রাক স্বাধীনতা যুগে (যখন সম্পূর্ণ কৃষি রাসায়নিক বর্জিত দেশীয় ফসলের চাষ হত) এদেশের কৃষকেরা বর্তমানের তুলনায় অধিক হারে ফসল ফলাতে পারতেন। নীচের তালিকায় এ রকম কয়েকটি তথ্য সমাবেশিত হল।

তিরুচিরাপল্লি থেকে প্রাপ্ত ৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি

তালিকা-২ : অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রথমে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জেলায় ধানের গড় উৎপাদন

জেলা	বছর	ফলন (টন/হেক্টার)
মাদুরা	১৭৯৬	৩.২
চিঙ্গলেপুট	১৭৮৮	২.৯
কোয়েম্বাটুর	১৮০৭	৭.৪৩

উৎস : Alaev'L. B., The system of agricultural production in south India. In Roychowdhury Tapan and Habib Irfan (eds.) The Cambridge Economic History of India. Vol.I,1982.

তালিকা-৩ : মুঘল যুগে উত্তর ভারতে ধানের ফলন

জমির প্রকৃতি	উত্তম পোলাজ*	মধ্যম পোলাজ*	অধম পোলাজ*
ফলন (টন/হেক্টর)	৫.২	৩.৪৫	২.৬৩

* পোলাজ = প্রতিবছর চাষযোগ্য কৃষি জমি।

উৎস : Ain E Akbari, Edited by Ahmed Fajlur Rahaman, Bangla Academy Dhaka.

শীলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে একটি মন্দির ১২০ কালাম (১ কালাম = ২২০.৮ পাউণ্ড) ধান/ভেলি (১ ভেলি = ৬.৬ একর) হারে খাজনা আদায় করত। ১১শ শতাব্দীর একটি শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে যে খাজনার হার ছিল ১০০ কালাম/ভেলি। ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি শীলালিপি থেকে দেখা যাচ্ছে যে খাজনার হার ১১২.৫ কালাম/ভেলি। যে সময়ের কথা আলোচনা হচ্ছে তখন জমির গড় উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ খাজনা ধার্য্য করা হ'ত। যদি তাই হয় তাই হয় তাহলে তখন জমির গড় উৎপাদনশীলতা ছিল ৪০০-৪৫০ কালাম/ভেলি, অর্থাৎ ১৫.১৭-১৭.০৭ টন/হেক্টর। (Alaev L. B 1982)।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর হয়তো খুব বেশি নির্ভর করা যায় না; কারণ সে যুগে খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হ'ত না, কিন্তু এই তথ্যে দেখা যাবে যে বেশ কিছু দেশী ধান আছে যাদের ফলন তথাকথিত HYV, MTU7029 (লাল স্বর্ণ)-র থেকে বেশি। আপাতত বর্তমান ভারতের কয়েকটি রাজ্যের ধানের ফলন দেখা যাক (তালিকা ৪ দ্রষ্টব্য)।

বর্তমান ভারতে ধানের ফলনের সাথে প্রাচীন ভারতের ধানের ফলনের তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে সবুজ বিপ্লবের ছয় দশক পরেও কৃষিতে সবচেয়ে উন্নত রাজ্যগুলির ধানের ফলনও প্রাচীন ভারতের ধানের ফলনের থেকে কম। তাই প্রাক সবুজ বিপ্লব যুগের খাদ্যাভাবের কারণ প্রযুক্তি নয় বরং ভ্রষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেশীয় ধানের ফলন সংক্রান্ত তথ্য

তালিকা-৪ : বর্তমান ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ধানের ফলন (১৯৯০-২০০০)

রাজ্যের নাম	ফলন (টন/হেক্টর) ১৯৯০	ফলন (টন/হেক্টর) ২০০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৩৬৮	২.৬৫০
কর্ণাটক	২.০০৬	২.৫৬৪
কেরালা	১.৯৫৭	২.২৬৪
পাঞ্জাব	৩.৫১	৩.৩৪৭
তামিলনাড়ু	৩.০৮৮	৩.৪৮১
পশ্চিমবঙ্গ	১.৯৪৬	২.২২৭
সর্ব ভারতীয় গড়	১.৭৪	১.৯৯৪

উৎস : Agricultural Statistics IFFCO New Delhi, in association with Directorate of Economics & Statistics, New Delhi

আধুনিক যুগের কিছু গবেষণা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে অনেক দেশীয় ধান আছে বিনা রাসায়নিকে যাদের ফলন হেক্টারে ৫০ কুইন্টালেরও বেশী। দেশী ধানের ফলন সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হল (তালিকা-৫ দ্রষ্টব্য),

বিখ্যাত ধান্য-গবেষক ড. আর. এইচ. রিচারিয়া ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে আদিবাসীদের তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে দেশীয় ধানের চাষ করে দারুণ ফলন পেতে দেখেছেন। তিনি এই রকম দুটি দেশীয় জাতের উল্লেখ করেছেন একটির নাম মোকোদো

অপরটির চিনার। চিনার জাতটি অতি সুগন্ধিও বটে (Dogra B 1983)। এরকম প্রামাণ্য তথ্য আছে যে ১৯৬৩ সালের আগেই ভারতীয় কৃষকেরা ১৪ টন/হেক্টর ধান ফলাতে সক্ষম ছিলেন (Richharia R H 1990)।

নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৃষি খামারে রাসায়নিক সার (NPK@৬০:৩০:৩০/৪০:২০:২০) ও জৈব সারের (গোবর সার ১০ t/ha এবং ধানের তুষের ছাই ১.৬ t/ha) প্রভাবে ধানের ফলন সংক্রান্ত একটি গবেষণা হয়। তিনটি জাতকে এই গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়, দুটি দেশী জাত, নাম যথাক্রমে কবিরাজসাল ও

ব্যবহার করা শুরু হয়। ধানের আরও বেশ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যাদের সাথে উচ্চ ফলনের সম্পর্ক নিবিড়। এবং এরকম অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেশী ধানে রয়েছে। যেমন কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বেশি হলে শীষের দৈর্ঘ্য, ও শীষে দানার সংখ্যা সাধারণতঃ বেশি হয় (Tao Wu et. al. 2013)। ফ্ল্যাগ লিফের থেকে যে খাদ্য সংশ্লেষিত হয় তার প্রায় সবটাই ধানের দানায় জমা হয়। ফ্ল্যাগ লিফের ক্ষেত্রফল বাড়লে শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা তৎসহ ফলনও বাড়ে (Roel C. Rabara et.al.2014)। পাতা যত খাড়া হবে তত সূর্যালোক শোষণের ক্ষমতা বাড়ে, এবং গাছগুলিকে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে রোপণ করা যায়, এই দুটি কারণের

তালিকা-৫ : কয়েকটি দেশীয় ধান ও HYV, MTU7029 ফলনের তুলনামূলক চিত্র

জাতের নাম	প্রতি গোছায় শীস যুক্ত পাশকাঠির সংখ্যা	প্রতি শীসে দানার সংখ্যা	১০০টি দানার ওজন	ফলন (কুইন্টল/হেক্টর)
বাঁশতারা	৮.০	২৩০	২.৪৮	৪৮.৬৫
যুগল	১০.০	১৮৮.২	৩.০৬	৫২.৩২
কবিরাজসাল	১২.৩	১১৪.০	২.১৪	৫৩.২৪
সাবনসাল	১০.৭	১৪৯.২	৩.০৭	৪৮.২৮
শিউলি	১২.০	২৩১.২	৩.২৮	৫৪.৪৩
MTU7029	১০.০	১৪০.০	২.০৩	৪৭.৯২

উৎস : Deb D., Seeds of tradition, seeds of future, Folk rice varieties of Eastern India. RFSTE. New Delhi (2005)

রাধাতিলক এবং একটি HYV নাম MTU 7029। গবেষণায় দেখা যায় যে জৈব সার প্রয়োগে কবিরাজসালের ফলন রাসায়নিক বা জৈবসার প্রয়োগে MTU 7029-এর থেকে বেশী (Paul A, et al 2011)।

উচ্চ ফলনের জন্য খর্বতাই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। সবুজ বিপ্লবের সময় কয়েকটি খর্ব বা প্রায়-খর্ব জাতের ধানকে উচ্চফলনশীল হিসাবে

মিলিত প্রভাবে ফলন বাড়ে (Zhiming, Feng et. al. 2016)। বিভিন্ন দেশী ধান যেমন কেরালাসুন্দরি, কবিরাজসাল, যুগল, খাড়া, বহুরূপী ইত্যাদিতে এইসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় (লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা) এবং এগুলির ফলনও ভালো। দেশীয় ধানের যে জাতগুলি লম্বা তারা যে সব সময় ঢলে পড়ে যায়, এ ধারণাও সত্যি নয়। যদি ধানের কাণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে লিগনিন থাকে, কাণ্ডে জাইলেম

ফ্লোয়েম জাতীয় কলার পরিমাণ বেশি থাকে, কাণ্ডের ব্যাস বেশি হয়, এবং কাণ্ডের প্রাচীরের স্থূলত্ব বেশী হয় তাহলে কাণ্ড যথেষ্ট দৃঢ় হয় (Chuanren D. et. al. 2004; Ookawa T et.al. 2010) এবং লম্বা হওয়া সত্ত্বেও ঢলে পড়ে না।

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ধানের ফলন বাড়াবার জন্য প্রচুর রাসায়নিক সার আর কীটনাশক দিয়ে ঐ বেঁটে HYV-র চাষ অপরিহার্য ছিল না। ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত না করে দেশীয় ধানের চাষ করলেও ফলন বাড়ানো যেতো, তাতে পেষ্টের এই বে-লাগাম উপদ্রব হ'ত না, উপরন্তু ধানক্ষেত থেকে মাছ, কাঁকড়া, গেঁড়ি গুগলি ইত্যাদি প্রচুর প্রোটিন জাতীয় খাবার পাওয়া যেতো।

উপসংহার

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের কৃষকেরা ধানের অসংখ্য, বহু বিচিত্র গুণ সম্পন্ন জাত নির্বাচন করেছেন। ধানক্ষেতের বাস্তুতন্ত্রের অধ্যয়ন করেছেন। এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে এক পরিবেশ বান্ধব সুস্থায়ী কৃষি প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই জ্ঞান প্রজন্মের পর প্রজন্মের অভিজ্ঞতায় চাষিদের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাসে আর উপকথায়। ইঁদুর এক ভয়ঙ্কর স্তন্যপায়ী পেষ্ট, যার ক্ষতি করার ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। অন্যদিকে ধানক্ষেতের আশেপাশে যত রকমের প্রাণী আছে তাদের মধ্যে লক্ষ্মীপ্যাঁচা ইঁদুরের নিপুনতম শিকারি। এই প্রাণীটিকে সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর বাহন হিসাবে কল্পনা করা, এই প্রাণীটি কোনো চাষির ধানক্ষেতে বসলে তাকে লক্ষ্মীমন্ত চাষী বলে ভাবা কৃষক সমাজের বাস্তুতন্ত্র তথা খাদ্যজাল সংক্রান্ত জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান যেভাবে কোনো ঘটনাকে মূল্যায়ণ করে, পরিসংখ্যানবিদ্যা যেভাবে একাধিক ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা নির্ভরশীলতার নিরূপণ করে, সেইসব পদ্ধতি নিঃসন্দেহে নিরক্ষর কৃষক সমাজের অজানা ছিল। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ লব্ধ বিপুল তথ্যের ভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করে তারা যে সিদ্ধান্তসমূহ করেছিল তার সবকটিই একেবারে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ছিল কৃষক সমাজের এই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণ করা, প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিকে রাখা আর অপ্রয়োজনীয়-গুলিকে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তা হল না। সবুজ বিপ্লব নামক প্রতিষ্ঠানটি কৃষিবিজ্ঞানের ঠিকাদারি পাবার পর দেশীয় কৃষকদের যাবতীয় জ্ঞানকে চরম অবহেলায় খারিজ করে দেওয়া হলো, লক্ষাধিক দেশী জাতকে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই নিম্নফলনশীল বলে দাগিয়ে দেওয়া হল, কীটনাশক বিষ ছাড়া রোগ পোকার উপদ্রব আটকানো সম্ভব নয় এরকম একটা চরম অবৈজ্ঞানিক ধারনার প্রচার চালানো হলো সর্বব্যাপী। এর নীট ফল হল এই যে একদিকে সার বিষ কীটনাশকের ব্যবসা করে বহুজাতিক কোম্পানীর মুনাফা আকাশ ছুঁলো, অন্যদিকে কৃষক আর আত্মহত্যা শব্দদুটি প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ালো। বর্তমান কর্পোরেট কৃষির প্রধান দর্শনই হল হল জমির উর্বরতা শক্তি নিঙড়ে, বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে, যতটা সম্ভব মুনাফা করে নেওয়া। এর বিরদ্ধে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে প্রধান কর্মসূচি করে এক ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। কৃষিবাস্তুতন্ত্রের জ্ঞান কৃষি উৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, তার উপর কৃষকদের পরিপূর্ণ অধিকার কায়েম না হলে কৃষির এই সংকট থেকে পরিত্রাণ নেই।

তথ্যসূত্র :

- Alaev L.B., The system of agricultural production in South India. In Roychowdhury Tapan and Habib Irfan (eds.), The Cambridge Economic History of India. Vol.I, 1982.
- Alex Keene, Study of small mammal populations within two Barn owl

corridors at Folly Farm, Bioscience Horizon, Volume 2,Number 2, June 2009
- Ashikari M et.al, Loss of function of a Rice Gebberellin Biosynthetic gene, *GA 20 oxidase (GA20ox-2)*, Led to Rice 'Green Revolution'. Breeding Science 52:143-150, 2002
- Bera P.K., Rice Research Station, Chinsura, Dist. Hooghly, West Bengal: Change in pest scenario after HYV introduction in West Bengal. In Proceedings of Workshop on *Conservation and Community Copyrights of Folk Crop Varieties.* WWF-India. Kolkata 1996,
- Chuanren D. et al., Relationship between the minute structure and the lodging resistance of rice stems. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 35, 155-158, 2004
- Dogra B., The Ecologist, 13:84, 1983
- Gross Briana L. and Zhao Zhijun, Archaeological and genetic insights into the origins of domesticated rice. 6190-6197, PNAS, Vol.111, No. 17, April 29, 2014
- Heckman, C.W., Rice field ecology in Northeastern Thailand. Monographs Biologicae 34,1-228. Dr. W. Junk Publishers, The Hague. 1979.
- Jian Xie, Ecological mechanisms underlying the sustainability of the agricultural heritage rice-fish coculture system. PNAS, E1381-E1387, Vol.108, No.50, December 13, 2011
- Kazushige Sogawa and Pathak M.D., Mechanism of Brown Plant Mopper Resistance in Mugdo Variety of Rice (Hemiptera: Delphacidae) Appl. Ent. Zool. 5(3), 145-158, 1970
- Keizi Kiritani, Pest Management in Rice. Ann. Rev. Entomol. 24, 279-312, 1979
- Krishnaiah. K. & Varma N. R. G., Changing Insect Pest Scenario in the Rice Ecosystem-A National Perspective. [www.rkmp.co.in/site/default/ris/research-theme/: changing insect pest scenario in the rice ecosystem.pdf.] 2011
- Ookawa T et.al., Biomass Production and Lodging Resistance in 'Leaf Star', a New Long-Culm Rice Forage Cultivar. Plant Prod. Sci. 13(1), 58—66, 2010
- Okuno A. et. al., New Approach to Increasing Rice Lodging Resistance and Biomass Yield Through the Use of High Gibberellin Producing Varieties: PLOS ONE, Volume 9, Issue 2, February 2014
- Paul Anupam et. al., Comparative study on chemical and organic nutrient management of rice during *kharif* season in Nadia district of West Bengal, Proceedings of International Symposium on System Intensification Towards Food & Environmental Security, BCKV, Kalyani WB., 2011
- Richharia R H and Govindaswami S., Rices of India. Academy of Development Science, Maharastra, India, 1990
- Roel C. Rabara et. al. Phenotypic Diversity of Farmers' Traditional Rice Varieties in the Philippines. Agronomy 2014, 4, 217-241; doi: 10.3390/agronomy 4020217 (2014).
- Settle W. et.al., Managing Tropical Rice Pest Through Conservation of General Natural Enemies and Alternative Prey. Ecology, 77(7), pp 1975-1988, 1996.
- Tao Wu et.al. Gene SGL, encoding a kinesin-like protein with transactivation activity, is involved in grain length and plant height in rice. Plant Cell Reports, October 2013
- Zhiming Feng et. al. SLG controls grain size and leaf angle by modulating brassinosteroid homeostasis in rice : Journal of Experimental Botany, Vol. 67, No.14, 2016

প্রকৃতি বান্ধব চাষ ব্যবস্থার সন্ধানে

অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়
E-mail : drcsc.ardhendu@gmail.com

জৈব/জৈবিক/জৈবনিক/প্রাকৃতিক/সজীব/স্বাবলম্বী /সুস্থায়ী আদি নানা নামে আমরা প্রথাগত চাষের বিকল্প খোঁজ করার চেষ্টা করছি। এই বিকল্পগুলির কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, না কি এ কেবল 'দিনেরাত্রে, জল ঢেলে ফুটো পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবারে!' পৃথিবীর জন সংখ্যা বর্তমানে ৭.২. বিলিয়ন অর্থাৎ ৭,২০০,০০০,০০০ (একশো কোটি = এক বিলিয়ন) 'Foresight Report'- এ একজন বিদেশী বৈজ্ঞানিক বলেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৯.৫ বিলিয়ন। সুতরাং আরো উন্নত বীজ আদি (Gene) পরিবর্তিত ফসল লাগবে; সারের প্রয়োগের হার, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশী বেশী করা দরকার। এখানে স্মরণ রাখা দরকার, ওই চাহিদাগুলি সব অঙ্কের হিসাব, ৪০% খাবার বা তারও বেশী এখনই গুদামে পচে বা ইঁদুরে খেয়ে বা ক্রয় ক্ষমতার অভাবে নষ্ট হয়।

এবার ভারতের তথ্যের ওপর একটু নজর দেওয়া যাক [প্রথমেই বলে রাখা ভাল, দেশের বা রাজ্যের মানুষ কত, কারাই বা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে অথবা সঠিক খাবারের অভাবে ভুগছে, পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। সে অর্থসঙ্গতি বা সময় কোনওটাই আমার নেই। আমি যথাসম্ভব ২০০১ আর ২০১১-র জনগণনা আর কিছু সরকারী নথির তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই লিখছি। ভুল ভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে দেবেন]। পয়লা মার্চ ২০০১-এ ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১০২৭ মিলিয়ন, বিশ্বের জনসংখ্যার ১৭% আর মোট জমি ছিল পৃথিবীর ২.৪২%, ২০১১-র Census report বলছে জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১২১ কোটি আর গড় ঘনত্ব ছিল ৩৮২/বর্গকিমি। পশ্চিম বাংলার মোট এলাকা ছিল ৮৮,৭৫২ বর্গকিমি। আর বর্গকিমি প্রতি জনসংখ্যা ১০২৮ (২০০১ সালে ৯০৩ থেকে বেড়ে) অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে জোতজমির উপর চাপ ক্রমবর্দ্ধমান, দেশের থেকেও বেশী হারে।

এক নজরে সবুজ বিপ্লবের পৃষ্ঠভূমি

১৯৪২ সালে বাংলায় বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যদিও শুধু উৎপাদন কম ছিল, না, লাভের আশায় গুদামে তালাবন্ধ রাখা হয়েছিল, সেই নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ১৯৬৫ সালে ও ১৯৬৬ সালে খরা হয়েছিল ও টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে বিদেশী ঋণ রাতারাতি ৩০% বেড়ে যায় এবং আমদানীর খরচও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকার চাপে 'পেট্রো-কেমিক্যাল ভিত্তিক' সবুজ বিপ্লব শুরু হয়। খাদ্যের বিনিময়ে সার, তেল, কৃষি যন্ত্রপাতি আসতে শুরু করে যেগুলি সরকার থেকে ঋণ, ভর্তুকি আদির উদ্যোগে বিতরণ শুরু হয় এবং ভূমি সংস্কারের ওপর জোর না দিয়ে, যে সব অঞ্চলে মাটি একটু ভাল, জলাভাব নেই বা খাল কেটে আনা সম্ভব, মোটামুটি রাস্তাঘাট আছে সেখানেই রাসায়নিক উপাদান ও নতুন নতুন প্রজাতির বীজ (প্রধানতঃ গম, ধান ও পরে আরও কিছু পণ্যের জন্য) দিয়ে সবুজ বিপ্লব চালু হয়। বিক্রীর টাকা, শর্ত অনুযায়ী দেশের বাইরে না নিয়ে গিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ আদির পেছনে লাগান হয়, এভাবেই দেশের বৈজ্ঞানিকরা পরম্পরাগত চাষীর জ্ঞান ভুলে গিয়ে ও তা নিয়ে গবেষণা কমিয়ে শুধু 'আধুনিক' একফসলী চাষ ও সঙ্কর জাতের বীজের ওপরই জোর দেন। দেশের অনেক ধানও যে ভালই ফলন দেয়, বেশী জলাবদ্ধতা

বা খরা সহ্য করতে পারে ও রোগ-পোকাও ভাল সহ্য করে সে কথা বেশীর ভাগ কৃষি বিজ্ঞানীরা ভাল করে দেখার চেষ্টাও করেন নি, সুযোগ ও হয়ত পান নি। বীজ, সার, কীটনাশক আদি উপাদান, ভর্তুকি, ভারী যন্ত্রপাতি/আধুনিক প্রযুক্তির পেছনে বিনিয়োগ ও কৃষিঋণ দেওয়া, কৃষিপণ্য কেনা, পরিবহণ, ভাণ্ডারণ প্রভৃতির জন্য মূলধন ও কাঠামো, কম দামে বিদ্যুৎ আদির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে সবুজ বিপ্লব পৌঁছে গেল। ১৯৬৬-৬৭-তে ভারতে ১.৯ million Ha-এ ৭৪.২ million tonne খাদ্যান্ন উৎপাদন হয়েছিলো, পাঁচ বছরের মধ্যে চাষ জমি বেড়ে ১৫.৪ million Ha-এ দাঁড়াল ও ১০৮.৪ million tonne খাদ্য শস্য উৎপাদন হ'ল। আমরা সাময়িক লাভের চমকে আত্মহারা হয়ে গেলাম ও পরিবেশের দূষণ ও মাটি, জল, ফসল বৈচিত্র্যের অবক্ষয়কে অবৈজ্ঞানিকদের ভুয়ো বিপদবাণী বা অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিলাম, উন্নতির গাড়ী এগিয়ে চলল কিন্তু সুস্থায়ী উন্নয়নের ভিত তৈরী হল না। সমপরিমান ফসল পাওয়ার জন্য আট-দশ গুণ সার ও আট দশ রকম সার, সাত আট রকম আগাছানাশক, কীটনাশক, রোগনাশক ব্যবহার করা শুরু করলাম, বীজের দামও কোনও ফসলের ক্ষেত্রে ৩০-৪০ গুণ বেড়ে গেল। চাষীর ঋণের বোঝায় নাকাল হওয়া শুরু হ'ল।

১৯৯৫ সাল নাগাদ বিশ্বের বাজারেও বড় পরিবর্তন এল। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার ফলস্বরূপ জাতীয় সরকারগুলির উপর ভর্তুকি, করে ছাড়, আমদানী কর তুলে নেওয়ার জন্য ধনী দেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (বিশ্বব্যাঙ্ক আদি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে) ভাবে চাপ আসা শুরু হল। যেসব চাষী লাভের লোভে ও নানা প্রচারে প্ররোচিত হয়ে বিশাল জমিতে তুলো, আখ, তামাক, সঙ্কর ভুট্টা (পশুখাদ্য হিসাবে) চাষ করছিলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অনিয়ন্ত্রিত বাজারের ওঠা-নামার ধাক্কায় তাঁদের আত্মহত্যার সংখ্যা এখন প্রতি বছর গড়ে ১০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। বিপ্লব আজ চাষীর রক্তে রাঙা। এই যদি বড় ও মাঝারী চাষীর অবস্থা হয়, তাহলে যারা তাদের জমিতে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষী হিসাবে কাজ করত, তাদের অবস্থা সহজেই অনুমানযোগ্য।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী যাঁরা ১-২ Hectare-এর বেশী জমি, তাও আবার একাধিক টুকরোয় সবুজ বিপ্লবের লাভ কোনও সময়েই খুব একটা পান নি। কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতি, বীজ, পাম্পসেট কেনার ক্ষমতা তাঁদের নেই বলেলেই চলে। যে দেশী গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, মাছ-গুগলি তাঁরা চাষ করেন, সেগুলি বেশীর ভাগ কৃষি আধিকারিকের চোখে পিছিয়ে থাকা মানুষের পশুপাখী বা ফসলের চাষ। তাঁদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করার জন্য টাকা পয়সাও খুব কম এবং ইচ্ছারও যথেষ্ট অভাব। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে এই যে বেড়ে চলা কৃত্রিম উপাদানের ভরে দাঁড়িয়ে থাকা ও এগিয়ে চলা, যন্ত্র নির্ভর (ও তাই প্রধানতঃ খনিজ তেল নির্ভর) চাষ ব্যবস্থা, তাকে এখন প্রথাগত বললেও, তার বয়স কিন্তু এক শতাব্দীরও কম। এই এক শতাব্দীর মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি যা কিছু প্রকৃতির দান বা ecosystem service, যেমন মাটির তলার জীবাণু জগত, যা নাইট্রোজেনের ও নানা খনিজের যৌগ তৈরী করে, নানা কীট-পতঙ্গ, যারা পরাগ সংযোগ দ্বারা বীজ তৈরীতে ভূমিকা নেয়, যে জৈব অবশেষ যা মাটিতে মিশে কার্বন, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায় আর মাটিকে জমাট বাঁধতে দেয় না, যে জীব-বৈচিত্র্য, যা রোগ-পোকা ও স্থানীয় দুর্যোগের প্রভাবে সব ফসল একসাথে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে আসছে, শিল্পজাত দ্রব্য দিয়ে সেগুলিকে বিস্থাপিত করা। ভেবে দেখা দরকার বিজ্ঞান কি মানুষের সেবায় নিয়োজিত না বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থার কুক্ষিগত?

আজ আমরা যে সব সমস্যার মুখোমুখি

ভারতের জনসংখ্যা আজ ১-২ billion এবং প্রতিবছর ১.৩% বাড়ছে, এত হাঁকডাকের ও বিপ্লবের পরেও ১৯৪ million লোকের দুবেলাও খাওয়া জোটেনা, তারও বেশী মানুষ যে খাদ্য ও জল খাচ্ছে সেটা নিরাপদও নয়, যথেষ্টও নয়। অর্দ্ধেকেরও বেশী কৃষিক্ষেত্রে সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই। একের তিন ভাগ জমিতে সেচ দিতে আমরা ভূগর্ভের থেকে যে জল তুলি তার ৮০% মতো ব্যবহার করি এবং তাই এভাবেও আর বেশী দিন চলবে না। মাথাপিছু প্রায় ০.২৯৫ Ha সিঞ্চিত জমি আছে প্রতি বছর তা ১.৩% হারে কমে চলেছে। প্রতি বছর ১২০ থেকে ১৪০ m Ha এলাকার মাটি ধুয়ে যাচ্ছে বা চাষ অযোগ্য হওয়ার মুখে। অতিরিক্ত কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাটি, জল আজ দূষিত। আগে কৃষিজমিতে শিকারী মাছ, ব্যাঙ, পাখি আদি পাওয়া যেত, গেঁড়ি গুগলি, চিংড়ি আদিও ছিল; মোট উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে আমরা আধপেটা খাওয়া মানুষের থালা থেকে এই প্রোটিন জাতীয় খাবার বাড়ানোর বদলে, অদৃশ্য করার কাজে সাফল্য লাভ করেছি। যেভাবে আমরা রাসায়নিক সার (বিশেষতঃ Nitrogen-এর যৌগ), পাম্পসেট ও ট্রাক্টর আদির জন্য ডিজেল আদি পোড়াই তাতে বায়ুমণ্ডলে N_2O নিঃসরণের হার বেড়েই চলেছে। গরু, শুয়োর, মুর্গী আদির বড় খামার (factory farm) থেকে প্রচুর পরিমাণে মিথেন আমাদের পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলছে।

এক কথায় বলা যায় বর্তমান প্রথাগত চাষের বিকল্প খুঁজে বার করতে হলে একসাথে অনেকগুলো সমস্যার কথা মাথায় রাখতে হবে যার কিছু আর্থ-সামাজিক এবং আগেও ছিল, যেমন বৈষম্যময় সম্পদ বন্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন, খাদ্য সংরক্ষণ আদির পরিকাঠামোর অভাব আদি। আর কিছু সমস্যার উৎস হ'ল যেসব সমাধানের পথ, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা আমরা বেছে নিয়েছি : যেমন এক বা দুই ফসলী চাষ ব্যবস্থা ও নানা কৃত্রিম রসায়ন সৃষ্ট দূষণ, যার ফলে বহু মানুষের যথেষ্ট খাদ্য নেই বা খাদ্য নিরাপদ নয় (এই দূষণ শুধু ক্ষেতেই আটকে নেই আশেপাশের জলাজমি, জঙ্গল আদিরও বহুল ক্ষতি করছে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার আদি খরচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে, অথচ ঝুঁকিও কমছে না। ফলে গ্রাম-গঞ্জ ছেড়ে আজ বহু মানুষ কাজের খোঁজে শহরমুখী এবং অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কাজে যুক্ত হচ্ছে।

পরম্পরাগত ও প্রচলিত/প্রথাগত দু ধরনের চাষ থেকেই আমাদের কিছু কিছু শেখার আছে, কিন্তু বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার দ্রুত মোকাবিলা করতে হলে আমাদের নতুন কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভাবতে ও কাজ করতে হবে। চাষীদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের কৃষকদের কাজ করছেন, ও যাঁরা সচেতন উপভোক্তা তাঁদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

সমাধানের পথে বিকল্প চাষ/বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক চাষ, সুস্থায়ী চাষের কিছু মূল নীতি

১. মাটির ভিতর অজস্র জীবিত অনুজীব, পোকা মাকড় কাজ করে চলেছে এদের সুরক্ষা আমাদের কর্তব্য। কর্ষণ যথাসম্ভব কমাতে হবে। ৩-৪ বছরের মধ্যে যান্ত্রিক কর্ষণ বন্ধ করার চেষ্টা আমাদের একটি প্রধান লক্ষ্য। মৃত মাটিকে জীবিত করে তুলতে প্রথম দিকে কিছু তরল সার, অণুখাদ্য বা জীবাণু সার, সবুজ সার, কেঁচো সার আদি ব্যবহার করতে পারা যায়। কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলির প্রয়োগও বর্জন করতে হবে।

২. বৃষ্টির জলের প্রতিটি ফোঁটা, মাটির ওপরে বা নীচে সঞ্চয় করতে হবে। ক্ষুদ্রসেচ, বিন্দুসেচ

আদির মাধ্যমে কম জলে সেচ দিতে হবে। মাটির ভিতরে জৈব উপাদানের ভাগ বাড়াতে পারলে, সারও কম লাগে, জল ধারণের ক্ষমতাও বাড়ে, উৎপাদকতা ও সহনশীলতাও বাড়তে থাকে।

৩. জায়গা যেহেতু সীমিত, শাক-সব্জী, গাছ-গাছালি ও জীব-জন্তু (ডাঙ্গার ও জলের) নিবিড় চাষের মাধ্যমে বহুস্থল ব্যবসা গড়ে তুলতে হবে। জীব-বৈচিত্র্য বাড়িয়ে বহুফসলী চাষ ফিরিয়ে আনা জরুরী।

৪. ক্ষেতের তৈরী গৌণ ফসল, আপনিই গজিয়ে ওঠা গাছ-গাছালি, পশু পাখীর বর্জ্য আদির পুনর্চক্রায়ণ একান্ত প্রয়োজন। সুনিবিড় চাষে সার-গাদা, বায়োগ্যাস, ছোট পুকুরের ব্যবহার খুবই জরুরী।

৫. যতদূর সম্ভব সৌর বিদ্যুৎ, শ্রম শক্তি, পশু-পাখীর শক্তি ও বায়োগ্যাস প্রভৃতি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হবে।

৬. স্থানীয় গাছ-গাছালি ও অন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা ও ব্যবহারগুলি ভালভাবে জানতে হবে। স্থানীয় জ্ঞানের সাথে আধুনিক বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেসব ফসলের বীজ উৎপাদন করা যায় না, সেগুলির চাষ না করাই ভাল।

৭. নিজের পরিবার ও এলাকার প্রয়োজন আগে মেটানো দরকার। মশলাপাতি, ওষধি আদি কম ওজনের জিনিষকেই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা দূরে পাঠানো যায়।

৮. সহায়ক দল বানানো ও যৌথ পুঁজি তৈরী করাকে প্রাথমিকতা দিতে হবে।

৯. নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, ও তথ্য বিনিময় করা সুস্থায়ী চাষ ব্যবস্থা তৈরীর জন্য আবশ্যিক।

পরিশেষ

কাজ ও চিন্তা ভাবনার ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, ও কিছু নিয়মনীতিকে বা ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের প্রকৃতি বান্ধব বা প্রকৃতির আদলে চাষ সম্ভব।

বিশেষ সংযোজন :

আমরাও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলাতে নানা চাষীর দল, কৃষি বিজ্ঞানী, শহুরে বাগানী, প্রসার কর্মী, বীজ সংরক্ষক, ক্রেতা সমিতি, ছাত্র-ছাত্রী দল আদির সহযোগিতায় কাজ করে চলেছি। আপনাদের উদ্যোগ সম্পর্কেও জানতে চাই। আমাদের সংগঠনের ওয়েবসাইট হ'ল : www.drcsc.org, আর কার্য্যালয়ের ঠিকানা ৫৮A, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলিকাতা-৭০০ ০৪২।

আমাদের জানা অজানা যে মানুষেরা
মানবকল্যাণে সমাজকল্যাণে পরিবেশকল্যাণে
নীরবে জীবন উৎসর্গ করেছেন
তাঁদের জানাই আমাদের শ্রদ্ধা

বাতাসের গুণগত মান : বায়ুদূষণে প্রথম সারিতে কলকাতা

অপর্ণা চক্রবর্তী
E-mail : apachakrabarti@hotmail.com

বাতাসের গুণগত মানের নিরিখে কলকাতা ভারতের পয়লা নম্বরের বায়ু-দূষিত শহরের শিরোপা পেয়েছে। বিগত তিন বছরের শীতে, বিশেষ করে যে মাসগুলিতে বায়ুদূষণের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি থাকে, তখনকার বাতাসের গুণগত মানের বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে শিরোপা এ যাবৎ রাজধানী শহর দিল্লির দখলে ছিল তা এখন আমাদের তিলোত্তমা শহর কলকাতার দখলে চলে এসেছে। এই ভয়াবহ বায়ুদূষণের প্রভাব জনস্বাস্থ্যের ওপর যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষতিকারক আঘাত হানছে, এই সুযোগে দূষণ থেকে রেহাই পাওয়ার চিকিৎসা-ওষুধপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের ব্যবসা করে মুনাফা কামাচ্ছে কিছু ব্যবসায়ী ও স্বাস্থ্য-কারবারী। তেমনিই বায়ুদূষণ প্রতিরোধের নামে শহরের দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষদের জীবিকার অবলম্বনগুলিকে বন্ধ করে দেবার অপচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে; কিন্তু দূষণের মূল যে কারণগুলি, যা বাস্তবিক উন্নয়ন, বা বলা ভাল, আজকের বাজ-ওয়ার্ড 'বিকাশ'-এর ভিত্তি, তাকে উচ্ছেদের প্রকৃত চেষ্টা, সরকার বা নাগরিক সমাজ, কোন স্তরেই নেই।

শিল্পবিপ্লবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানবজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয় পণ্য ও ভোগ্যপণ্য যত তৈরী হয়েছে তত বেশি পরিমাণে নানান দূষক পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছে মাটি, জল আর বাতাসে। এর মধ্যে বাতাস দূষণের কারণে পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ফল যে মারাত্মক বিধ্বংসী হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক কালের জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিশ্বের নামকরা পরিবেশ জার্নাল 'ল্যান্সেট'-এর এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে একুশটি এশিয় দেশের সবচেয়ে দূষিত হল চীন, ভারতের অবস্থান ঠিক তার পরেই। এর পর যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতিতে বায়ুদূষণের দৌড়ে এগিয়ে থাকা দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা চারপাশের বাতাসের গুণগত মান সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি না। এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা প্রত্যেকের থাকা দরকার।

বাতাসের গুণমান সূচক কি

বিগত একবছর ধরে সংবাদপত্রের পাতায় দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে ভারতের তিন মেট্রোপলিটন শহর কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বই-এর বাতাসের গুণমান সূচক। বাতাসের গুণমান সূচক বা AQI (Air Quality Index) সম্বন্ধে এখানে একটু বলে নেওয়া

তালিকা ১ : বাতাসের গুণমান সূচকের CPCB নির্ধারিত পর্যায়, রঙ ও শ্রেণি

AQI	রঙ	শ্রেণি	জনস্বাস্থ্যে প্রভাব
০-৫০	ঘন সবুজ	স্বাস্থ্যকর	জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব প্রায় নেই।
৫১-১০০	সবুজ	সন্তোষজনক	শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্তদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক।
১০১-২০০	হলুদ	মাঝারি দূষিত	শ্বাসগ্রহণ বিপজ্জনক; বিশেষ করে বয়স্ক, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ফুসফুস বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা হতে পারে।
২০১-৩০০	গাঢ় হলুদ	অস্বাস্থ্যকর	দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের বাইরে থাকা মানুষজনদের পক্ষে বিপজ্জনক।
৩০১-৪০০	লাল	ভীষণ অস্বাস্থ্যকর	দীর্ঘসময় শ্বাস নিলে সুস্থ মানুষেরও নাক, গলা ও ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা।
৪০১-৫০০	গাঢ় লাল	চরম বিপজ্জনক	সুস্থ মানুষ অল্পসময় শ্বাসগ্রহণ করলেও শ্বসনতন্ত্রের সমস্যা দেখা দেবে।

প্রয়োজন। AQI হল সাধারণ মানুষকে তাদের পারিপার্শ্বিক বাতাসের গুণগত মান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার এক সহজবোধ্য ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB) আই আই টি কানপুর, ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল, বিভিন্ন অসরকারী সংস্থার বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদদের সহযোগিতায় এই সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এই ব্যবস্থায় বাতাসের আটটি দূষকের (পিএম ২.৫, পিএম ১০, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ওজোন এবং লেড) গাঢ়ত্ব বা মাত্রা নির্ণয় করা হয়। এই কাজে প্রতিটি শহরে ৬ থেকে ৭টি করে মনিটরিং স্টেশন থাকে যেখানে সারাদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে দূষকের মাত্রা মাপা হয়। বাতাসের গুণমান সূচক মাপার নির্ধারিত শর্ত হল : ৮টি দূষক উপাদানের মধ্যে অন্তত তিনটির গাঢ়ত্ব জানা থাকবে, যার মধ্যে একটি আবশ্যকীয় উপাদান পিএম ২.৫ বা পিএম ১০। এই নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতিতে পাওয়া তথ্যে দিনের যে সময়ে যে দূষকের গাঢ়ত্ব সর্বোচ্চ সেটাই হল শহরের ঐ দিনের ঐ সময়ের AQI । একদিনের ২৪ ঘন্টার প্রতি ঘন্টায় AQI এইভাবে নির্ণয় করে তার গড় নেওয়া হয় । এই গড় মানই হল ঐ নির্দিষ্ট দিনের প্রাপ্ত AQI। বাতাসের গুণমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০ এর গাঢ়ত্ব মাইক্রোগ্রাম / ঘনমিটার এককে মাপা হয় আর বাকি দূষক পদার্থগুলির ঘনত্বের একক ppm বা ppb ধরা হয়। AQI ব্যবস্থায় বাতাসের বিভিন্ন দূষকের গাঢ়ত্বকে একটি বিশেষ সংখ্যা, রঙ এবং শ্রেণিতে প্রকাশ করা হয় (one number-one colour-one description system)। বাতাসের গুণমান সূচকের CPCB নির্ধারিত ৬টি পর্যায় (range), তার উপযোগী ৬টি রঙ ও শ্রেণী তালিকা : ১-এ উল্লেখ করা হল। .

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর নতুন দিল্লিতে ১৭ অক্টোবর ২০১৪-য় জাতীয় স্তরে বাতাসের গুণমান সূচক মাপার পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতি প্রধানমন্ত্রীর ''স্বচ্ছ ভারত অভিযান'' কর্মসূচীর অন্তর্গত। বায়ুদূষণ মূলতঃ শহরাঞ্চলের সমস্যা। তাই শহরের নাগরিকদের নিজেদের অঞ্চলের বাতাসের দূষণজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করার জন্যই AQI মাপার সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রতিটা রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে একযোগে দেশের ২৪৬টা শহরে National Air Monitoring Programme (NAMP)-এর কাজ চালায়। দেশের যে সব শহরে ৫ লক্ষের বেশি মানুষ বাস করে সেই শহরগুলিতে NAMP-র কাজ শুরু করার পরিকল্পনা কেন্দ্র সরকারের লক্ষ্য। বাতাসের দূষক পদার্থের গাঢ়ত্ব মাপার কেন্দ্র (Monitoring Station) দু'রকমের হয় : যন্ত্রচালিত (automatic) এবং মনুষ্যচালিত (manual)। বিশেষজ্ঞদের মতে মনুষ্যচালিত যন্ত্রে দূষণ পরিমাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভবপর হয় না, এই পরিমাপ দূষণকেন্দ্রের কর্মীদের দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফলে এই ধরনের কেন্দ্রগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য সবসময় সঠিক হয় না। অন্যদিকে যন্ত্রচালিত পদ্ধতিতে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাতাসের দূষণ মাত্রা মাপা হয়, এই পদ্ধতি অনেক ত্রুটিমুক্ত এবং পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে এটিই গ্রাহ্য পদ্ধতি। যন্ত্রচালিত দূষণ পরিমাপক কেন্দ্রগুলো CAAQMS (Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station) নামে পরিচিত। আমাদের দেশে ৬৯টি শহরে মোট ১৩১টি CAAQMS আছে (আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য)। এ রাজ্যের দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, হলদিয়া, হাওড়া ও কলকাতার মত ছয়টি বড় শহরে বাতাসের দূষণমাত্রা মাপার যন্ত্রচালিত পদ্ধতি চালু আছে। দেশের প্রতিটা শহরের AQI তথ্য প্রতিদিন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দপ্তরে সরাসরি on-line ব্যবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। CPCB-র AQI Bulletin Archive-এ প্রতিটি শহরের প্রতিদিনের AQI তথ্য প্রদর্শন করা হয়। এখানে সমস্ত পুরানো তথ্যও নথিবদ্ধ থাকে যা বায়ুদূষণ সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে আরও প্রায় ৫৭৩টি কেন্দ্রে NAMP প্রকল্পে মনুষ্যচালিত যন্ত্রে AQI মাপা হয়। তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনটের (পিএম ১০, সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড) বেশি দূষকের মাত্রা মাপার ব্যবস্থা করা

যায় নি। আর অনেক ক্ষেত্রেই সপ্তাহে দু-একদিন ঐ কেন্দ্রগুলিতে দূষণ মাপা হয়। দূষণ মাপার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করা হলেও, এগুলির ক্যালিব্রেশনের ওপর তথ্যের যথার্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করে। সরকারি ব্যবস্থায় নিয়মিত ক্যালিব্রেশন হয় কিনা, বিশেষ করে বিদেশী যন্ত্রের ক্ষেত্রে, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তাই তথ্যের যথার্থতার প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

কলকাতার বায়ুদূষণ

২০১৭-১৮ সালের শীতকালে যখন সারাদেশে দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে তোলপাড় চলছে তখন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে দূষণের নিরিখে কলকাতার বাতাস প্রায়ই দিল্লিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা ঐ তথ্য মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি সংবাদপত্রের দূষণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় দিল্লির মার্কিন এমব্যাসি ও কলকাতার কনস্যুলেট-এ স্থাপিত যন্ত্র থেকে। মার্কিন কনস্যুলেটের রেকর্ড কেন্দ্রের গাইডলাইন অনুযায়ী সংগৃহীত নয়, ফলে যে তথ্য তাতে ধরা পড়ছে তা সঠিক নয়। মার্কিন কনস্যুলেট তাদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা করেছে বাতাসের দূষণ সংক্রান্ত তথ্য ধর্মতলা এলাকার তাদের হো-চি-মিন সরণীর অফিসের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু পরিবেশকর্মীদের যুক্তি একটিমাত্র কেন্দ্রের রিপোর্ট দিয়ে গোটা শহরের দূষণমাত্রার পরিমাপ করা যায় না। এটা যেমন সত্যি তেমনি মার্কিন কনস্যুলেটের তথ্য যে একটা ইঙ্গিতবাহী তাতে সন্দেহ নেই। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতেই হয় ২০১৮-র নভেম্বরে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আর্কাইভে কলকাতার বাতাসের যে দূষণচিত্র ধরা পড়েছে তা ঐ ইঙ্গিতেরই প্রতিফলন। এদিকে CPCB-র ওয়েবসাইটে ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে কলকাতার বাতাসের কোনো AQI রেকর্ড নেই। কারণ হিসাবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে তাদের যন্ত্রগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ায় নতুন করে বসানোর কাজ চলছে তাই CPCB-তে রাজ্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাতে পারছে না। কালকাতার ১৪টি জায়গায় যন্ত্র বসিয়ে দূষণ মাপে

তালিকা-২ : দিল্লি ও কলকাতার বাতাসের পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০ এর বার্ষিক গড় গাঢ়ত্ব (মাইক্রোগ্রাম / ঘনমিটার)

দূষক কণা	কলকাতা		দিল্লি		ভারত সরকার নির্ধারিত মাত্রা	হু নির্ধারিত মাত্রা
	২০১৫	২০১৬	২০১৫	২০১৬		
পি এম ২.৫	৫২	৭৪	১২৩	১৪৩	৪০	১০
পি এম ১০	১৫	১৩৬	২২৮	২৯২	৬০	২০

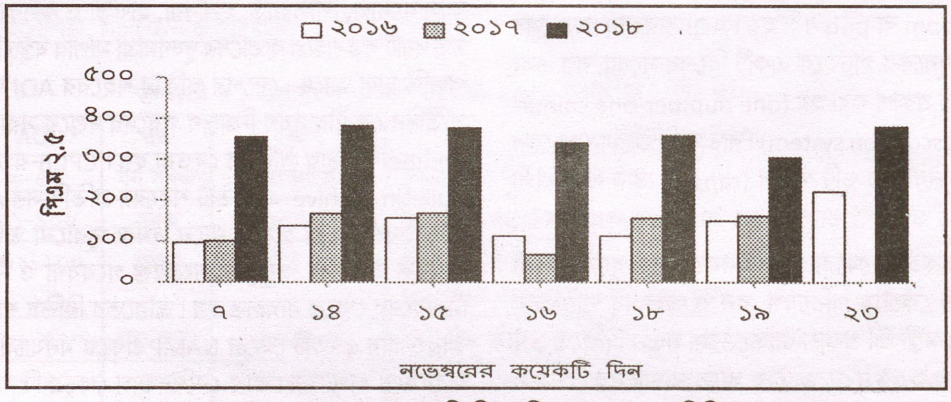

চিত্র ১ : ২০১৬ থেকে ২০১৮'র নভেম্বরের কয়েকটি দিনে পিএম ২.৫-এর নিরিখে কলকাতার বায়ুদূষণের হাল [২০১৬ এবং ২০১৮-এর তথ্য CPCB সূত্রে প্রাপ্ত; ২০১৭-এর তথ্য মার্কিন কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত]

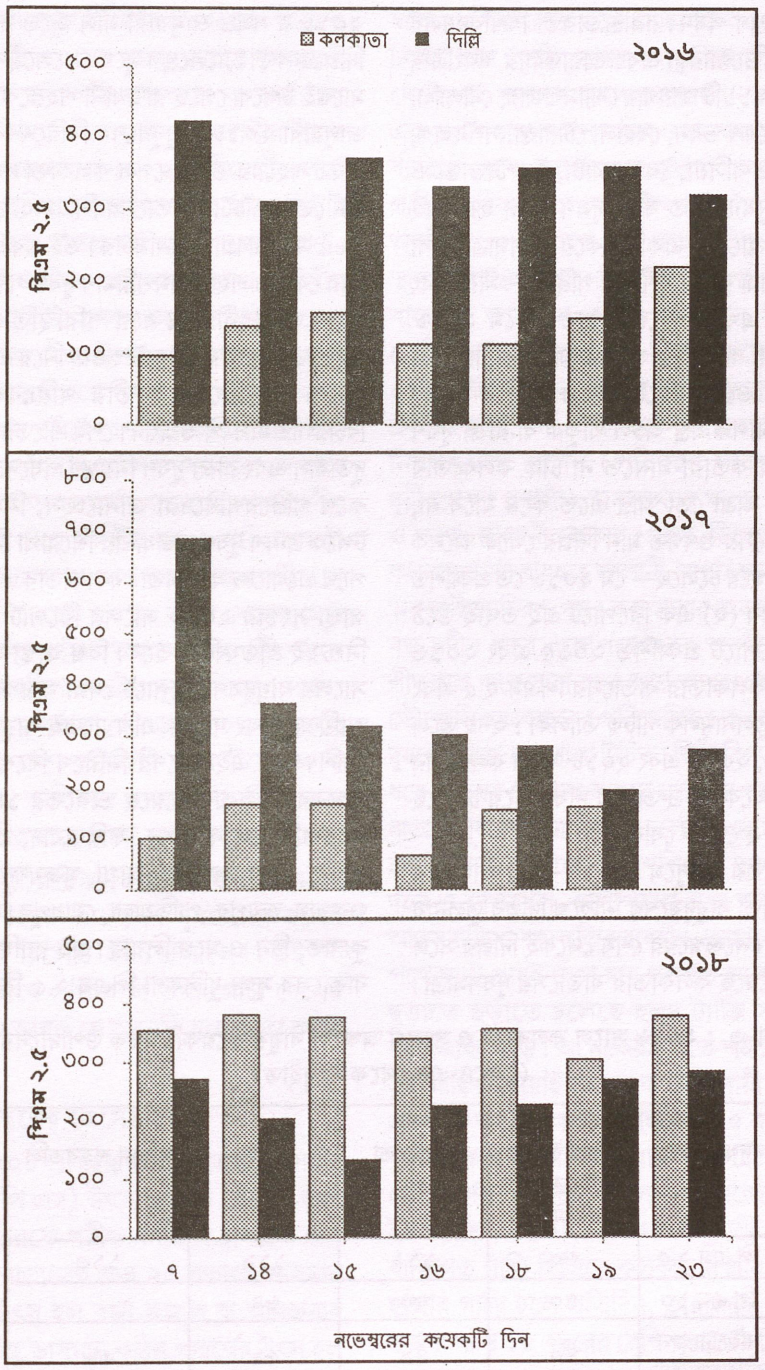

চিত্র-২ : ২০১৬ থেকে ২০১৮'র নভেম্বরের কয়েকটি দিনে পিএম ২.৫-এর নিরিখে দিল্লি ও কলকাতার বায়ুদূষণের তুলনা

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (বি টি রোড), ভিক্টোরিয়া এবং তারাতলায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র রয়েছে। বাকি ১১টি জায়গায় (শ্যামবাজার, মৌলালি, মিন্টোপার্ক, পরিবেশ ভবন, বেহালা চৌরাস্তা, সল্টলেক, ডানলপ ব্রিজ, তপসিয়া, বৈষ্ণবঘাটা, উল্টোডাঙা ও মোমিনপুর) মনুষ্যচালিত যন্ত্রে দূষণ মাপা হয়। এই কেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে দু-একদিন করে দূষণমাত্রা মাপা হয়। এমন দায়সারা কাজে খুশী নয় পরিবেশকর্মীরা এবং আম জনতাও। এখানে উল্লেখ্য গত ১৭মে ২০১৮ থেকে কলকাতার বাতাসের গুণগত মান কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওয়েবসাইটে আবার প্রদর্শিত হচ্ছে। তবে দূষণ পরিমাপক যন্ত্র অচল থাকুক বা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারা মানতে না চাক কলকাতার বাতাসে বিষের মাত্রা তো আর এতে কমে যাবে না, কলকাতার বাতাসের গুণগত মান দিল্লির থেকে অনেক দ্রুতহারে খারাপ হয়ে চলেছে— মে ২০১৮ তে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) এক রিপোর্টে এই তথ্যই উঠে এসেছে। ঐ রিপোর্টে প্রকাশিত ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের দিল্লি ও কলকাতার বাতাসের পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০-এর তুলনামূলক গাঢ়ত্ব তালিকা : ২-এ তুলে ধরা হল। ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে কলকাতার বাতাস দিল্লির থেকে যে দ্রুতহারে দূষিত হয়ে চলেছে তা চিত্র-১ এবং ২ থেকে বোঝা যায়।

বিগত শীতের মরসুমে (২০১৭-১৮) আমাদের মহানগরী কলকাতা বায়ুদূষণের নিরিখে দিল্লির তুলনায় পিছিয়ে থাকেনি। নভেম্বরের শেষ থেকেই দিল্লির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে কলকাতার বাতাসের দূষণমাত্রা। ২০১৮'র সমগ্র জানুয়ারী মাস জুড়ে ধারাবাহিকভাবে দিল্লিকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে কলকাতা, মাঝে মাঝেই টপকে গেছে রাজধানী শহরকে। এভাবেই ১৬ জানুয়ারী ২০১৮ বায়ুদূষণের নিরিখে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তকমা পেল কলকাতা। খবরে প্রকাশ ঐ দিন ভোর পাঁচটায় বাতাসের পিএম ২.৫ এর মাত্রা ছিল ৫৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার। ওই একই সময়ে বিশ্বের আর কোনও শহরে সমপরিমাণ দূষণ পরিলক্ষিত হয়নি। পুরো জানুয়ারী মাস ধরে পরিস্থিতি এমনই হয় যে কলকাতার রাস্তায় শ্বাসকষ্ট হওয়া নিয়ে এজলাসে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন জাতীয় পরিবেশ আদালতের বিচারপতি এস পি ওয়াংদি। শেষ শীতের মরসুমে মার্কিন দূতাবাস এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিবেশবিদেরা জানাচ্ছেন, নিয়মিত দিল্লিকে টপকে ক্রমশ দূষণ রাজধানীর শিরোপা ছিনিয়ে নেওয়ার পথে এগোচ্ছে কলকাতা। কলকাতার এই অবস্থান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের বায়ুদূষণ রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র পৃথিবীতে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়াতেই বায়ুদূষণ সবচেয়ে বেশি। আর এই দূষণের নিরিখে বিশ্বের প্রথম ২০টি শহরের তালিকায় রয়েছে ভারতের ১৪টি শহর। এই শহরগুলি হল কানপুর, ফরিদাবাদ, বারাণসী, গয়া, পাটনা, দিল্লি, লখনৌ, আগ্রা, মুজফ্ফরপুর, শ্রীনগর, গুরুগ্রাম, জয়পুর, পাতিয়ালা, যোধপুর। বাকি শহরগুলি কুয়েত, চিন ও মঙ্গোলিয়ার। এই র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছে বাতাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণা পিএম ২.৫ নিয়ে। অন্য আর

তালিকা-৩ : ২০১৬ সালে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে বায়ুর কয়েকটি দূষক উপাদানের তথ্য (CPCB-এর থেকে সংগৃহীত)

দূষক কণা	বছরে গড়ে থাকা উচিত (মাইক্রোগ্রাম /ঘনমিটার)	কলকাতা	হাওড়া	দক্ষিণ শহরতলি
পি এম ২.৫	৬০	১১২	১১৯	১১৩
পি এম ১০	৪০	৭০	৬৭	
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড	৪০	৪৯	৫৯	৩৮

একটি তালিকা করা হয়েছে পিএম ১০ নিয়ে। তাতেও বিশ্বের প্রথম ২০টি শহরের মধ্যে রয়েছে ভারতের ১৩টি শহর। এই তালিকায় কলকাতা বা আমাদের রাজ্যের কোনও শহর না থাকাটা রাজ্যবাসীর পক্ষে মোটেই স্বস্তির খবর নয়। কারণ হু-র রিপোর্ট বলছে দূষক কণাগুলোর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি রয়েছে কলকাতা হাওড়া সহ আশেপাশের তল্লাটে। এই সংস্থা বায়ুদূষণ নিয়ে ভারতসহ সমগ্র পৃথিবীর নানারঙের এক মানচিত্র প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভারতের রেড জোন উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে শুরু করে উত্তর ভারত হয়ে পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত, যাতে পশ্চিমবাংলার তল্লাট বেশ অনেকটাই। যাই হোক কলকাতা এবং হাওড়ার বাতাসের দূষণমাত্রা যে বছর বছর বেড়েই চলেছে তার সমর্থন পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারীর (২০১৮) প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধনের রাজ্যসভায় পেশ করা আর একটি তথ্য থেকে। তিনি জানিয়েছেন ২০১৬ সালে দেশের মোট ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩০৩টি শহরে একটি সমীক্ষা করেছিল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। তাতে দেখা যাচ্ছে কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলি সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহর উদ্বেগজনক বায়ুদূষণের গ্রাসে। তালিকা : ৩-এ প্রদত্ত তথ্য থেকে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আসানসোল, দুর্গাপুর, রাণিগঞ্জ, হলদিয়া সহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি শহরে বাতাসের দূষণমাত্রা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এই রিপোর্ট ২০১৬ সালের। এই দুই বছরে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের বায়ুদূষণের চিত্রের আরও যে অবনতি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

কলকাতায় বায়ুদূষণের উৎসের খোঁজ

গত বছর (২০১৭) শহরাঞ্চলের বাতাসে ভাসমান কঠিন পদার্থের (পি এম) উৎস জানতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায় বাতাসের প্রায় ২৫ শতাংশ ভাসমান কঠিন পদার্থের উৎস হল বর্জ্য জঞ্জাল বা আবর্জনার জ্বলন। এ ছাড়া কিছু ভাসমান কঠিন পদার্থের উৎস হল গাড়ির ধোঁয়া, যার মাত্রা প্রায় ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। বাকি ৫০ শতাংশের মধ্যে মোটামুটি ২০ শতাংশ আসে নির্মাণ শিল্প (বাড়ি, রাস্তা, সেতু, উড়ালপুল ইত্যাদি) থেকে, ১০ শতাংশ আসে কলকারখানার ধোঁয়া থেকে এবং ১০ শতাংশ আসে জমির ও যানবাহনের নিয়মবিরুদ্ধ ব্যবহার থেকে (ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন চলাচল, গাড়ির অধিক বোঝা থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া ইত্যাদি), আর অবশিষ্ট ১০ শতাংশ হল দ্রুত গতির বাতাস দ্বারা স্থানান্তরিত আশপাশের ভাসমান কণা। কোনো স্থানে বাতাসে ভাসমান কঠিন পদার্থের উৎসের এই শ্রেণিবিন্যাসের তারতম্য নির্ভর করে ওই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, জমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শহরাঞ্চলের প্রকৃতি (রাস্তা, নদী, পার্ক, গাছপালা ইত্যাদির পরিমাণ), নিয়মশৃঙ্খলা পালন (পরিবহণ ব্যবস্থা, আবর্জনা দূরীকরণের প্রণালী), জনসংখ্যার ঘনত্ব, গাড়ির সংখ্যা ও ঘনত্ব, জ্বালানীর প্রকার (গ্যাস, ডিজেল, পেট্রোল), কলকারখানার ব্যবহৃত জ্বালানী, নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর। কলকাতার অবস্থান গঙ্গার মত বড় নদীর ধারে বঙ্গোপসাগরের অনতিদূরে, এখানে শীতকাল বাদে সারা বছর আর্দ্র আবহাওয়া থাকে। তাই ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রা কম থাকা উচিত। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে নভেম্বর থেকে শুরু করে মার্চ মাস পর্যন্ত কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণগুলি হল— গাড়ির ধোঁয়া, নির্মাণশিল্পের দূষণ, আবর্জনার দহন ও দেওয়ালি, কালীপুজো এবং অন্যান্য উৎসবে আতসবাজি ও শব্দবাজির ব্যবহার। আমাদের মহানগরীর পথে ঘাটে প্রায়ই দেখা যায় গলগল করে কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে চলেছে হলুদ ট্যাক্সি সহ বেশ কিছু বাণিজ্যিক গাড়ি। অনেকেরই মতে শহরের বায়ুদূষণে এই গাড়ির ধোঁয়াই সবথেকে বেশি দায়ী। এদিকে প্রায় একদশক আগে কলকাতা হাইকোর্ট ১৫ বছরের পুরানো বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। ন্যাশনাল ইনফর্মেশন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি মিলিয়ে কলকাতায় প্রায় ৪৪ লক্ষ ২২ হাজার গাড়ি চলে প্রতিদিন, তার মধ্যে ১৩ লক্ষ ২৪ হাজার গাড়ি ১৫ বছরের বেশি পুরানো। বোধহয় সত্যিই কলকাতা এখন গাড়ির বৃদ্ধাশ্রম হয়ে উঠেছে। এত

পুরানো গাড়ি কোনও শহরে দেখা যায় না। কলকাতা শহরের বিভিন্ন ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিয়নের নেতারা দাবি করেন যে পুরানো ট্যাক্সি নিয়মিত বাতিল করা হয়। কিন্তু বহু ট্যাক্সিই যে নিয়মিত দূষণ ছড়ায় সেটাও তারা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাদের দাবি পুলিশ কিম্বা দূষণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো ঠিক মতো গাড়ি পরীক্ষা করে না তাই দূষণের এত বাড়াবাড়ি। এ ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পরিবেশ দপ্তরের বক্তব্য, পথেঘাটে জরিমানা করার দায়িত্ব পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের, তাঁরা জরিমানার নির্দেশিকা দুই দপ্তরের কাছেই পাঠিয়ে দেন। গাড়ির দূষণ পরীক্ষা বা নির্দিষ্ট সময়ে পুরানো গাড়ি বাতিল হয় না, এই অভিযোগ মানতে নারাজ কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগের পদস্থ কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, নিয়ম মেনে পরিবহণ দপ্তর গাড়ি বাতিল করে। তার বাইরে ফাঁকি দিয়ে যেসব গাড়ি চলছে সেগুলে ধরতে নিয়মিত অভিযান হয় এবং দূষণ ধরা পড়লে জরিমানাও হয়। আসল চিত্রটা অর্থাৎ কলকাতা শহরে কত গাড়ি নিয়মিত দূষণ ছড়াচ্ছে, জানে না খোদ পরিবহণ দপ্তরই। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ পরিবেশ আদালতে উপস্থিত থেকে কার্যত তা স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ সচিব। এদিকে বায়ুদূষণ রোধে কলকাতা ও হাওড়া থেকে অনেক আগেই ভারত স্টেজ থ্রি (বি এস থ্রি) বাণিজ্যিক গাড়ি সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল পরিবেশ আদালত। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা হল পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ৯০ শতাংশই বি এস থ্রি বা বি এস টু গাড়ি। পাশাপাশি শহরতলি থেকে যে সব গাড়ি প্রতিদিন শহরে ঢোকে সেগুলো সবই ডিজেল চালিত বি এস টু বা বি এস থ্রি গাড়ি। এক্ষেত্রে কোনও নজরদারির ব্যবস্থা নেই। এর সঙ্গে দূষণ পরীক্ষাতেও উপযুক্ত নজরদারির অভাব রয়েছে মেনে নিয়েছেন মোটর ভেহিকল কর্তৃপক্ষ। যাই হোক গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ কোর্টের নির্দেশ আর তা পালনের ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে চাপান উতোর, এর মধ্যে পড়ে দূষণগ্রাসে জেরবার হয়ে চলে কলকাতা-হাওড়ার নগরজীবন।

যান-জনিত বায়ুদূষণে সুরাহা দূর অস্ত

যানবাহনে পেট্রোল ডিজেলের বদলে কমপ্রেস্ড্ ন্যাচারাল গ্যাস বা সি এন জি ব্যবহার করলে বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেকটা কমে। কলকাতায় সি এন জি ব্যবহারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (গেইল) এবং রাজ্য সরকারী সংস্থা গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর যৌথ প্রচেষ্টা চলছে গত প্রায় ১০ বছর ধরে। বায়ুদূষণ রোধে সিএনজি সরবরাহে টালবাহানার প্রেক্ষিতে মামলা হয়েছিল। তার পরেও দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী দুই সংস্থার মধ্যে গ্যাসের দাম, পরিবহণ এবং বন্টন পরিকাঠামো নিয়ে মত পার্থক্যে আটকে ছিল যৌথ কোম্পানী গড়ার প্রক্রিয়া। অবশেষে ২০১৮ সালের জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান গেইলের সঙ্গে যৌথ কোম্পানী গড়ায় সম্মতি জানিয়েছে রাজ্য। ১৪ ফেব্রুয়ারী রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদন হলে পরবর্তী চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই বৃহত্তর কলকাতায় কোল বেস্ড্ মিথেন (সি বি এম) পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রাজ্য মন্ত্রীসভা ২৬ ফেব্রুয়ারী কেবল কলকাতা পুর এলাকাতেই প্রকল্পটি সীমাবদ্ধ রাখার অনুমোদন দেয়। কারণ হিসাবে সরকারপক্ষ জানায় কলকাতা পুর এলাকাই সবচেয়ে দূষিত। তাই তার দূষণ ঠেকাতে সেখানেই প্রথম সি এন জি চালু করতে চায় রাজ্য। রাজ্যের এই অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে গেইল এবং পরিবেশ আদালত। তাদের বক্তব্য— হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কে এম ডি এ এলাকার দূষণও কম নয়। এছাড়াও পুর এলাকায় প্রকল্পটি সীমাবদ্ধ রাখলে তা গেইলের পক্ষে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে কিনা সেটিও ফের মূল্যায়ণ করে দেখা প্রয়োজন। গেইলের পরিকল্পনা ছিল ক্রমান্বয়ে ডিজেল চালিত বাস কমিয়ে বৃহত্তর কলকাতায় সিএনজি চালিত বাস রাস্তায় নামাতে হবে। ডিজেল বাসের তুলনায় সিএনজি বাসের খরচ অবশ্য চার-পাঁচ লাখ টাকা বেশি। সে ক্ষেত্রে পুরানো অটো এল পি জি-তে রূপান্তরিত করতে সরকার যেমন খানিকটা ভর্তুকি দিয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও সরকারকে তেমন সাহায্য করতে হবে। এতে বায়ুদূষণ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু বছর শেষ হতে চলল, এই প্রকল্পের এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।

উন্নয়ন বনাম বায়ুদুষণ

ব্রীজ, রাস্তা, উড়ালপুল, আকাশছোঁয়া বহুতল, ঝাঁ চকচকে শপিং মল ইত্যাদি উন্নয়নের স্মারকে কলকাতা এবং শহরতলি এখন ভরে গেছে। এইসব নির্মাণ কাজের জন্য যে সব ভাসমান কঠিন পদার্থের কণা বাতাসে মেশে তাতে নাগরিক সম্প্রদায় জর্জরিত। রাজ্যে নির্মাণ শিল্পের দূষণ রুখতে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। ডিজেল জেনারেটর সেট ব্যবহার না করা, নির্মাণস্থল ঢেকে রাখা, নিয়ম করে জল ছেটানোর মত বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে বলা হয় নির্মাণ সংস্থাগুলোকে। নির্মাণ সামগ্রী ও বাড়ি ভাঙার বর্জ্য ওঠানো নামানোর জন্য এমন জায়গা বাছা উচিত যাতে যতটা সম্ভব কম ধুলো ওড়ে। নির্মাণ চৌহদ্দির মধ্যে যানবাহন চলাচলের রাস্তা ভিজে রাখা। নির্মাণ কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সঠিক মুখোশ সরবরাহ করা যাতে সূক্ষ্ম ধূলিকণা তঁদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ না করে। এই সমস্ত নিয়মও মানার নির্দেশ আছে CPCB-র আইনে। কিন্তু অনেকেই এইসব নিয়মকানুন মেনে চলে না। তাই নির্মাণ শিল্পের দূষণ ঠেকাতে নির্মাণ সংস্থাগুলিকে অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ির দাবি উঠেছে। ই আই এ (Environmental Impact Assesment) রিসোর্স এন্ড রেসপন্স সেন্টারের তরফে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে ২০১৬-র তুলনায় ২০১৭-য় নির্মাণক্ষেত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র দেওযার হার বেড়েছে। ২০১৬-য় ১৪৩টি আবেদনের মধ্যে ৪২টি ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিয়েছিল পরিবেশ ছাড়পত্র সংক্রান্ত কমিটি। অর্থাৎ ২৯ শতাংশ আবেদনে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায় ২৭টি ও কলকাতায় ১৫টি আবেদনে ছাড়পত্র মেলে। ২০১৭-য় ৪৯টি আবেদনের মধ্যে ১৫টিতে ছাড়পত্র মিলেছিল, অর্থাৎ ৩০ শতাংশেরও বেশি। এর বেশির ভাগই সেই কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগণায়। নিয়ম লঙ্ঘন করে নির্মাণ কাজ চালালে দোষীর শাস্তি বা জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার বা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হাতে নেই। এই ক্ষমতা আছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সরকারী নির্মাণ কাজগুলোই সব থেকে বেশি মাত্রায় পরিবেশ বিধির তোয়াক্কা করে না। বিদ্যাসাগর সেতুর কলকাতা অ্যাপ্রোচ রোডের মুখে দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তা সারাই এর কাজ চলছে। কোন ঢাকাঢাকির বালাই নেই। প্রচন্ড শব্দ করে রোড-কাটার রাস্তার প্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে চলেছে। সেখানে এত ধুলো উড়ছে যে দূর থেকে মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচলের সময় যাত্রীদের নাক মুখ ঢেকে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নের পিছনের সেতুর রাস্তাও প্রকাশ্যে পীচ গলিয়ে সারানো হয়। এই বছর (২০১৮) অক্টোবর মাসের শেষে এক সপ্তাহ ধরে রবীন্দ্র সেতুর রাস্তা মেরামতির কাজ করেছে সেতুটির রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। তাতে প্রকাশ্যে সেতুর ওপর 'হট মিক্সিং মেশিন' ব্যবহার করা হয়। এতে কাঠ জ্বালিয়ে পীচ, স্টোন চিপস্, চুন ও বালি মেশানো হয়। ফলে ঐ যন্ত্র থেকে যে কালে ধোঁয়া বের হয় তাতে সংলগ্ন বাতাস মারাত্মক দূষণের কবলে পড়ে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের রায় ছিল কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি প্রভৃতি শহরে প্রকাশ্য জায়গায় পীচ গলানোর কাজ করা যাবে না। নির্দেশ অমান্য করলে অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। এখানে কেন্দ্রীয় সংস্থা নিজেরাই নির্দেশ অমান্য করে কাজ করে চলেছে। এদিকে ডিসেম্বর মাসে পরিবেশ কোর্টের নিষেধাজ্ঞায় কলকাতায় রাস্তা তৈরীর কাজ প্রায় বন্ধ। রাজ্য সরকার পরিবেশ কোর্টের কাছে আরও ছ'মাস ঐ মেশিন ব্যবহারের অনুমতির জন্য আবেদন করে। কিন্তু এক বছর আগেই পরিবেশ কোর্ট কলকাতা পুরসভাকে সতর্ক করেছিল। পুরসভা 'হট মিক্সিং মেশিন' বন্ধ করে 'কোল্ড-মিক্সিং' বা 'মাইক্রো সারফেসিং' পদ্ধতিতে রাস্তা মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এখন ফল ভুগতে হচ্ছে শহরবাসীদের। দিল্লিতে ২০১৪ সালে পরিবেশ কোর্টের নির্দেশে প্রকাশ্যে পীচ গলানো বন্ধ হয়ে গেছে।

ভাগাড়ের গ্যাস বা উৎসবের আতসবাজি : দূষণে কেউই পিছিয়ে নেই

শহরে জ্বালানী হিসাবে কাঠ বা কয়লার ব্যবহার এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত। এছাড়াও বর্জ্য জঞ্জাল বা আবর্জনা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার পদ্ধতিও বহুল

প্রচলিত। হাওড়া কলকাতার সরকারী ভাগাড়ে জৈব বর্জ্য থেকে উদ্ভুত মিথেন গ্যাসে প্রায়ই আগুন ধরে যায়। এতে অন্যান্য কঠিন আবর্জনাগুলো জ্বলতে থাকে। ফলে ভাসমান কণা সহ বিষাক্ত হাইড্রোকার্বন বাতাসে মেশে আর মারাত্মক দূষণ মাত্রা বাড়ায়। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের পাশে প্রমোদনগর ভাগাড়ে মিথেন গ্যাস থেকে নিত্যদিন আগুন জ্বলে। এর ফলে যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। ভাগাড়ের এই আগুন নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয় না। এদিকে বাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে যে পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস আর ভাসমান কণা মেশে তা ভাগাড়ের আবর্জনা দহনের দূষণের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সারাবছর ধরে এই দূষণের উৎস সক্রিয় না থাকলেও কালীপুজো দীপাবলী সহ কয়েকটা দিনের চরম দূষণে গোটা দেশের প্রচুর মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই দূষণের উৎসে রাশ টানার জন্য জাতীয় পরিবেশ কোর্ট ও দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রায় ২০ বছর আগে থেকে নির্দেশ জারি করে চলেছে। সেই থেকে সব রাজ্যেই বে আইনি বাজি তৈরীর কারখানার রমরমা। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১১টা আতসবাজির কারখানায় তাদের অনুমোদন রয়েছে। বাজি ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকদের হিসেবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ৩০ হাজার বাজির কারখানা রয়েছে। সে সব বেআইনি হওয়ায় পুলিশ পর্ষদ কারও কাছেই তাদের খবর থাকে না। মাঝে মাঝে কারখানায় দুর্ঘটনা আর মৃত্যু ঘটলে তখন কেবল প্রশাসনের টনক নড়ে। ঐ বেআইনি কারখানা বন্ধ করার উপায় আপাতত নেই বলে পুলিশ ও পর্ষদের কর্তারা বারবার স্বীকার করেছেন। রাজ্যে যেমন ট্যানারি এবং ফাউন্ড্রি পার্কের জন্য আলাদা জায়গা আছে তেমনই বাজি কারখানার জন্য এক বা একাধিক পৃথক জায়গার প্রয়োজন। রাজ্যের সব বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করতে চেয়ে পরিবেশ আদালতে মামলা করা হয়েছে। বাজি কারখানার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ হলে বেআইনি কারখানাগুলোকে চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে। এ ব্যাপারে অ্যাকশন প্ল্যান জমা দিতে পরিবেশ আদালত নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে বেশ কয়েক বছর আগেই। কিন্তু প্রশাসন এই নির্দেশ কার্যকর করার কি উদ্যোগ নিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। এদিকে দেখতে দেখতে বছর ঘুরে (২০১৮) আবার কালীপুজো আর দেওয়ালি উৎসব হয়ে গেল। দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রতিটা রাজ্যে বাজি পোড়ানোর জন্য দিনে দু'ঘন্টা করে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ঐ নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সারাদেশে আমজনতা দেদার আতসবাজি আর শব্দবাজি পোড়াল। ফল যা হওয়ার তাই হল। কালীপুজো ও দেওয়ালি দুই রাতেই দিল্লি, কলকাতা, হাওড়ার মত শহরগুলো ডুবে গেল গাঢ় ধোঁয়াশায়। যাদের ঐ দুই রাতে বাড়ির বাইরে বের হতে হয়েছে তারা প্রত্যেকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে। বাজির ধোঁয়ায় দৃশ্যমানতা গেছে কমে, কটু গন্ধে বাতাস ভারি, তাতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পরের দু'দিন খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিভিন্ন উড়ালপুল আর রাস্তার আবছা ছবি। এখানেও দিল্লিকে টেক্কা দিয়েছে তিলোত্তমা কলকাতা। দেওয়ালির দিন সন্ধ্যা সাতটায় দিল্লির আনন্দবিহারে বসানো যন্ত্রে বায়ুদূষণ সূচক ছিল ৩২৯, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যন্ত্রের সূচক ৩৪৬, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রের সূচক ৩৫৪, হাওড়ায় ৩৮২। আতসবাজি ও শব্দবাজির হাত ধরে যে পরিমাণ দূষণ মহানগরীতে ছড়িয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে তেমনটা দেখা যায়নি বলেই জানা গেছে। দীপাবলির রাতে কলকাতায় পি এম ১০ ছিল ১৭২৭ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (CPCB নির্ধারিত পি এম-১০ এর সহনমাত্রা ৬০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার), যা সর্বকালের রেকর্ড। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে চার বছর আগে একবার কালীপুজোর রাতে কলকাতার বাতাসে পি এম ১০-এর পরিমাণ ছিল ১৪১১.৮৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার। সাম্প্রতিককালে সেটাই সবচেয়ে দূষিত কালীপুজোর রাত ছিল বলে জানাচ্ছেন পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। তালিকা ৪ থেকে এই তথ্য পরিষ্কার বোঝা যাবে।

কলকাতা শহরে বাজির ধোঁয়ায় বাতাস দূষণের মূল কারণগুলো হল— (১) সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব এবং (২) উৎসে বাজি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা।

তালিকা-৪ : ২০১৩ থেকে ২০১৮'য় কালীপুজো ও দীপাবলীর রাতে কলকাতার বাতাসে পিএম ১০ এর মাত্রা (রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে প্রাপ্ত)

বছর	পি এম ১০ (মাইক্রোগ্রাম / ঘনমিটার)	
	কালীপুজো'র রাত*	দীপাবলী'র রাত*
২০১৩	৫২৭.৭০	৯২৮.০৮
২০১৪	১৪১১.৮৫	৫৮৩.৩৩
২০১৫	৬৮১.৯৫	৭৮৬.১৫
২০১৬	১৪৩.১১	২৪৬.৬১
২০১৭	৩১৭.৯৫	১০৯.৫০
২০১৮	৬০৯.৮৬	১৭২৭.০০

*রাত্রি ১১টা থেকে ১টার মধ্যে সংগৃহীত তথ্য; লক্ষণীয় ২০১৬ এবং ২০১৭-এর কালীপুজো ও দীপাবলীর রাতে পিএম ১০-এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম, কারণ ঐ দু'রাতেই বৃষ্টি হয়েছিল।

কলকাতায় বায়ুদূষণের কামড় অনেকটাই তীক্ষ্ণ

ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন দিল্লির তুলনায় কলকাতার দূষণ অনেক বেশি উদ্বেগজনক। কলকাতার জনঘনত্ব, রাস্তাঘাট, গাড়ি চলাচলের চরিত্র এবং যানবাহনের ব্যবহৃত জ্বালানী এর জন্য দায়ী। দিল্লির তুলনায় কলকাতার পথঘাটের পরিসর কম। তাই এই শহরে যানবাহনের গড় গতিও অপেক্ষাকৃত কম। আর লো গিয়ারে গাড়ি বেশি চললে বায়ুদূষণের হারও বেড়ে যায়। দিল্লির জন পরিবহণ ব্যবস্থা সি এন জি নির্ভর বলে অটোমোবাইল পলিউশন কলকাতার তুলনায় কম। কলকাতায় তো সিএনজি র বালাই নেই (একমাত্র ব্যতিক্রম অটো যা এলপিজি-তে চলে)। পেট্রোল ডিজেলের দহনে যে বিষাক্ত গ্যাস ও ভাসমান কণা নির্গত হয় সারাবছর ধরেই তা বাতাসকে দূষিত রাখে। এই শহরে গ্রীষ্ম ও বর্ষার আবহাওয়া আর্দ্র থাকে। বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। ফলে ঐ দুই ঋতুতে বাতাসে দূষণের মাত্রা কম থাকে। শীতকালের শুকনো আবহাওয়ায় বাতাসে ভাসমান কণার মাত্রা বেড়ে যায়। এই সময় কম উষ্ণতার কারণে বাতাসের ঘনত্ব বেশি থাকে। গরমকালের মত বাতাস অনেক উঁচুতে উঠতে পারে না, রয়ে যায় বায়ুমন্ডলের নীচের দিকে। মানুষকে ঐ দূষিত বায়ুতেই শ্বাসগ্রহণ করতে হয়। ফলে এই মরসুমে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের হারও বেশি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে লাগাতর দূষণে কলকাতা হাওড়া সহ সব শহরের অধিবাসীদের অল্প বয়স থেকেই অ্যালার্জি, অ্যাজমা, সিওপিডির (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ) মতো রোগভোগ বেড়েই চলেছে। চিকিৎসকরা বলছেন শিশুদের পাশাপাশি বয়স্করাই শ্বাসনালীর এই সব সমস্যার সবচেয়ে বড় শিকার। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে পরিবেশ গবেষণা সংস্থা সি এস ই একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে জানায় দেশে যত মানুষের অকালমৃত্যু ঘটছে তার ৩০ শতাংশই বায়ুদূষণের কারণে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী এ দেশে দু'কোটিরও বেশি সিওপিডি এবং প্রায় সাড়ে তিন কোটি হাঁপানির রোগী রয়েছেন। ২০১৬ সালের বায়ুদূষণের তথ্যের নিরিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট সম্প্রতি (অক্টোবর ২০১৮) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ভারতের পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের ৯৮ শতাংশ বায়ুদূষণের প্রকোপে পড়েছে। আয়ের নিরিখে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' গোত্রে থাকা দুনিয়ার বাকি দেশগুলিতেও একই ছবি বলে জানিয়েছে ঐ সংস্থা। এই দূষণ শুধু শহরাঞ্চলের নয়। গ্রামের শিশুদেরও ৫০ শতাংশের শ্বাসকষ্টের পিছনে দায়ী রান্নাঘরের ধোঁয়া। বিশ্বের ধনী দেশগুলোর ক্ষেত্রে ৫২ শতাংশ শিশুর ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বেশ কয়েক বছর আগে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও একটি বেসরকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় যাঁদের দিনের বেশির ভাগ সময় রাস্তায় নেমে কাজ করতে হয় তাঁদের শরীরে বায়ুদূষণজনিত ক্ষতির পরিমাণ বেশি। যে সমস্ত ট্রাফিক পুলিশকর্মীর ওপর সমীক্ষা করা হয়েছিল দেখা যায়— (১) তাঁদের মধ্যে ৫১.৮ শতাংশের ক্ষেত্রে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কম, (২) ৫৩ শতাংশের মধ্যে সিওপিডির প্রবণতা, এবং (৩) ৪২.৮ শতাংশ উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। সমীক্ষার সময় থেকে বর্তমানে বায়ুদূষণের হার আরও বেড়েছে। ফলে দুষণ জনিত প্রভাবও বেড়েছে। চিকিৎসকদের মতে দূষণ গোটা শরীরেই বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। কিছু

প্রভাব তাৎক্ষণিক কিছু আবার দীর্ঘস্থায়ী। গাড়ির ধোঁয়ার সাথে নির্গত বিষাক্ত হাইড্রোকার্বন ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ায়, ডিএনএর স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে, স্নায়ুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মাত্রাছাড়া দূষণ স্মৃতিশক্তিকেও দুর্বল করে দিচ্ছে বলে জানিয়েছে মার্কিন বিজ্ঞান পত্রিকা 'প্রসেডিং অফ ন্যাশনাল অকাডেমি অফ সায়েন্সেস'। আমরা সবাই জানি গ্রামাঞ্চলে শীতের অনুভূতি বেশি। কলকাতা হাওড়ার মত শহরে এখন হাতে গোনা কয়েকটা দিন শীত পড়ে। এর কারণও দূষিত বাতাস। এই বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকে, যা সরাসরি জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে না। কিন্তু মাটি থেকে বিকিরিত তাপ শোষণ করে রাখে ফলে বাতাসের উষ্ণতা বেশি কমতে পারে না।

.... তাই দূষণ রোধে যা করণীয়

কলকাতা ও হাওড়া শহরের বায়ুদূষণের মূল উৎস হল পেট্রোল ও ডিজেলচালিত যানবাহন। শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে পেট্রোল ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে সি এন জি, বায়ো ইথানল এবং ব্যাটারিচালিত যানবাহনের ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে অচিরাচরিত বিদ্যুতের (সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ ইত্যাদি) ব্যবহার বাড়ালে দূষণ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা যায়। সারা দেশের বড় বড় শহরগুলো বিষ-বাতাসে জর্জরিত। শহরে বিদ্যুৎচালিত যানবাহন চলাচলে উৎসাহ দিতে ফেম (ফাস্টার অ্যাডপশন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ইলেকট্রিক ভেহিক্লস) প্রকল্প শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পে যে কোনও বিদ্যুৎচালিত গাড়ি কেনার জন্য রাজ্য সরকারগুলোকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য করবে কেন্দ্র। ওই প্রকল্পের অধীনেই প্রথম ধাপে ১৩০টি বাস কেনার প্রস্তুতি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। তবে শুধু বিদ্যুৎচালিত যানবাহন তৈরী বা কেনার ব্যবস্থা করলেই হবে না, অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও করতে হবে। বায়ুদূষণের হার কমাতে কেন্দ্র নতুন আইন চালু করেছে। তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে ১০ শতাংশ অচিরাচরিত শক্তির উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সৌর এবং বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ০.০২২৯ মেগাওয়াট। ২০১৮-র মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ মেটাওয়াট। উৎপাদন বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের পাঁচ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ১০ মেটাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সারা রাজ্যে সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়ের ছাদ, ফাঁকা জমিতে বসানো হচ্ছে সোলার প্লান্ট। কিছু কিছু জলাধারেও ফ্লোটিং সোলার প্লান্ট বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। রাজ্যের WEBREDA (ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) এবং WBSEDCL (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড)-এর উদ্যোগে আলোশ্রী প্রকল্প, তিস্তা ক্যানাল ব্যাঙ্ক প্রকল্প, সোলার পিভি পাওয়ার প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় সোলার প্লান্ট বসানোর কাজ চলছে। অনেক জায়গায় উৎপাদনও শুরু হয়ে গেছে। BHEL-এর মত সরকারী সংস্থা এবং বিক্রম সোলার, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মত অনেক বেসরকারী সংস্থাও এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও অসরকারী সংস্থাও নিজেদের ছাদে সোলার প্লান্ট বসিয়ে প্রয়োজনের বিদ্যুৎ তৈরী করে নিচ্ছে। ইলেকট্রিক চালিত যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব থেকে এগিয়ে আছে নাগপুর শহর। ঐ শহরে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত ৪০টি চার্জিং স্টেশন চালু হয়েছে আর ২০০টি ইলেকট্রিক চালিত ট্যাক্সি চলছে। এছাড়াও নাগপুরে বায়োইথানলে ৫৫টি বাস চলে। বায়ো ইথানলের উৎস হল ধান, গম, কার্পাসের খড়, চিনিকল থেকে বের হওয়া আখের ছিবড়ে। বায়ো সি এন জি পাওয়া যায় টয়লেট ওয়াটার থেকে। নাগপুরে টয়লেট ওয়াটার থেকে মিথেন বের করে বায়ো সিএনজি প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। ইথানল ও বায়ো সিএনজি পেট্রোল ডিজেলের থেকে দামে অনেক সস্তা পড়ে এবং পরিবেশবান্ধব। এই সব প্রকল্পে স্টার্ট আপ সংস্থাগুলোও এগিয়ে আসতে পারে। আমাদের কলকাতায় নাগপুর শহরের মত বায়ো ইথানল বা বায়ো সিএনজি প্রকল্পের উদ্যোগ না থাকলেও ব্যাটারিচালিত গাড়ি ব্যবহারের চিন্তা ভাবনা চলছে। গ্রিন সিটি প্রকল্পের শো-কেস হিসাবে বেছে নেওয়া

হয়েছে নিউটাউন এলাকাকে। এখানে ব্যাটারিচালিত গাড়ি ও টোটো বেশি চলে। ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য কয়েকটি চার্জিং স্টেশন আছে। আরও বেশি সংখ্যায় চার্জিং স্টেশন বসানোর প্রকল্প নিয়েছে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। ব্যাক্তিগত উদ্যোগেও সৌরচালিত এক ই-চার্জিং স্টেশন বানানো হয়েছে। এই চার্জিং স্টেশন আই আই টি খড়্গপুর ক্যাম্পাসে বসানো হয়েছে যেখানে ই-রিক্সা ও ই-বাইক চার্জ করা হয়। এরপর বড় গাড়ি চার্জ করার ক্ষমতাযুক্ত চার্জিং স্টেশন বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গোটা রাজ্যে এই চার্জিং স্টেশন ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কলকাতা শহরে নির্মাণশিল্প, ভাগাড়, বাজি কারখানা আর হটমিক্স প্লান্ট থেকে যে দূষণ ছড়ায় তা নিয়ন্ত্রণ করাটা পেট্রল ডিজেল আর তাপবিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর মত অতটা কঠিন ব্যাপার নয়। পরিবেশ কোর্টের নির্দেশ মেনে পুরসভা ও প্রশাসন সক্রিয় হলে এই ধরনের উৎস থেকে দূষণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। রাজ্য প্রশাসনকে আইন মেনে চলার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। আইন না মেনে চলাটাই যে শহরের দস্তুর সেখান ঐ পদক্ষেপ নেওয়া হয়ত কঠিন কাজ। কিন্তু পরিবর্তন যদি ওপর মহল থেকে আসে তবেই সাধারণ মানুষ সচেতন হবে। প্রশাসনের পক্ষে এটা মোটেই অসাধ্য ব্যাপার নয়। গত বছর (অক্টোবর ২০১৭) যুব বিশ্বকাপের সময় সল্টলেক এলাকায় বায়ুদূষণ রোধে প্রশাসন যে সাময়িক ব্যবস্থা নিয়েছিল তাতে বায়ুদূষণের মাত্রা অনেকটাই কমেছিল।

শেষ কথা

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্যের ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ে তার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে ভারত অত্যধিক বায়ুদূষণের মোকাবিলায় নানান পরিকল্পনা নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করার গতি বহুগুণে বৃদ্ধি করা এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে জোরদার করার সময় এসেছে। সবাই জানে বায়ুদূষণের নিরিখে দেশের দুই শহর দিল্লি ও কলকাতা যথেষ্ট এগিয়ে। দিল্লি সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে যেটুকু তৎপরতা দেখিয়েছে, কলকাতার জন্য রাজ্য প্রশাসন এখনও সেটুকু করে উঠতে পারেনি। রাজ্য প্রশাসন যদি পরিবেশ নিয়ে ভাবে তাতে রাজ্যের অবস্থার কতটা উন্নতি হয় তা প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের পাশের ছোট্ট রাজ্য সিকিম। সেখানে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ১৯৯৮ সাল থেকে। চাষের কাজে শুধুমাত্র জৈব সার ব্যবহার করা হয়। প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ। ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচ টাকা করে কর দিতে হয় প্রত্যেক ধূমপায়ীকে। সংগৃহীত টাকা খরচ হয় পরিবেশ উন্নয়নে। সিকিম দূষণহীন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরীর পথেও এগোচ্ছে রাজ্য। যে সব গাছের শিকড় অনেকটা গভীরে সেগুলো কাটা নিষিদ্ধ অনেকদিন আগে থেকেই। ফলে গত পাঁচ বছরে রাজ্যে জঙ্গল বেড়েছে প্রায় চার শতাংশ। সিকিমের পরিবেশ উন্নয়নের এই সাফল্য এবং রাজ্যবাসীর সু-অভ্যাস একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাদের প্রয়োজন হয়েছে আইনের কড়াকড়ি। সুচিন্তিত নীতি ও নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকার। তবুও একটা কথা না বলে পারা যায় না। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে, নদী বাঁধ ও নদী গতিপথের পরিবর্তন জনিত কারণে তিস্তার মত নদীর অভাবনীয় ক্ষতি হয়েছে। তাই সিকিমের উন্নয়নের পরিকল্পনায় পরিবেশ গুরুত্ব পাওয়ার বিষয়টা আপাতগ্রাহ্যভাবে উপলব্ধ হলেও, শেষ বিচারে, প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আমাদের রাজ্যে পরিবেশের ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য চোখে পড়ার মতো। কলকাতা হাওড়ার মত শহরের বায়ুদূষণের মোকাবিলায় পরিবেশ আদালত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দিয়েছিল ২০১০ এবং ২০১৬ সালে। সেই কমিটির সুপারিশ মতো কিছু নির্দেশ জারি করে আদালত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নির্দেশের বেশির ভাগই পালন করা হয়নি। আদালতে বারবার এই বিষয়ে শুনানি হয়, আদালত বারবার হুঁশিয়ারি দেয় রাজ্যকে। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হয় না। অবশেষে ২৭ নভেম্বর ২০১৮ পরিবেশ আদালত রাজ্য সরকারকে পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা করে, যা দু'সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে জমা দিতে বলা হয়। অনাদায়ে প্রতি মাসে বাড়তি ১ কোটি টাকা করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কোর্ট। আর্থিক জরিমানা দেওয়াটা বোধহয় রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের থেকে অনেক সহজ কাজ। দূষণ দূরীকরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে

জনগণের করের টাকায় জরিমানার অর্থ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে বিশেষ ঝামেলা পোহাতে হবে না। ব্যাপারটা ধনে প্রাণে শহরবাসীর সর্বনাশ ঘটানোর অনিচ্ছাকৃত অপচেষ্টা বলেই মনে হয়।

শুধু তাই নয়, বাতাসে যত বিষ মিশবে আর তাই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে যত প্রচার বাড়বে, সমাজের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ তত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। ফলে হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের চেম্বারে ভিড় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে। সেখানে তাদের নাক, কান, গলা, ফুসফুস, হৃৎপিন্ডের নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদান দেওয়া হবে। ঐ সব পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিভিন্ন ওষুধ, নামি দামি ইনহেলার, আধুনিক মুখোশ, অত্যাধুনিক এয়ার পিউরিফায়ার ইত্যাদি ব্যবহারের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হবে। এই ওষুধ-মুখোশ-এয়ার পিউরিফায়ার কেনার জন্য দোকান এবং on-line-এ ভিড় বাড়বে দ্রুতহারে। শহরের বায়ু দূষিত বলে যত প্রচার পাবে এক শ্রেণির ব্যবসায়িক সম্প্রদায় তত ফুলে ফেঁপে উঠবে। দূষণের বিষ আর আগ্রাসী বাজার অর্থনীতির চাপে পড়ে নাগরিক সমাজের উঠবে নাভিশ্বাস।

চারদিকে এত গেল গেল রব উঠেছে। রাজ্য প্রশাসন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ধীরে হলেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। যাই হোক, বায়ুদূষণের প্রতিবিধান করার নামে যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন তাতে আসল কারণগুলোর আদৌ মূলোচ্ছেদ হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। জল মাটির দূষণের মত বায়ুদূষণের মূলে অন্যতম কারণ লাগামছাড়া উন্নয়নের কাজ কারবার। উন্নয়ন বলতে মানুষ বোঝে সবুজ গাছ-গাছালী, চাষের মাঠ আর জলাশয়ের নির্বিচারে ধ্বংসের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট, সুউচ্চ অট্টালিকা, শপিং মল আর অসংখ্য নানা কিসিমের মোটরগাড়ি। এই উন্নয়নের সুখ লাভ করে সমাজের অল্প কিছু মানুষ। আর বাসস্থান, জীবন ও জীবিকা হারানোর বিনিময়ে এর মূল্য ধরে দেয় বৃহত্তর মানুষের দল। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' আমাদের দেশে কখনই সম্ভব নয়। এখানে কিছু মানুষের বিকাশের জন্য অনেক কিছুরই বিনাশ ঘটে। বাতাসে বিষের মাত্রা কমানোর সদর্থক প্রচেষ্টা হিসাবে উন্নয়নে রাশ টানার কাজ কতটা হবে তা বলা মুশকিল। কারণ দূষণ সৃষ্টির পিছনে যে গোষ্ঠীগুলো দায়ী, তাদের লাভের এক বড়ো অংশ রাজনৈতিক দলগুলোকে তোষণ করার কাজে ব্যবহার হয়। তাই উন্নয়ন চলতে থাকবে, বায়ুদূষণও বাড়বে তরতরিয়ে।

কিন্তু এই দূষণের প্রতিকারের নামে চা-ওয়ালা, ইস্ত্রী-ওয়ালার কয়লার উনুন যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, গরীব ট্যাক্সিওয়ালার মোটর গাড়ি যদি পরিবেশ বান্ধব নয় বলে নথীভুক্ত না করা হয়, তবে তা হবে গরীব মানুষের জীবিকায় হাত দেওয়া। আর অন্যদিকে যদি ক্রমশ বাড়তেই থাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ, হাউজিং কমপ্লেক্সের কাজ, হরেক কিসিমের গাড়ির সংখ্যা, তবে তা অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই কেবল বাড়িয়ে তুলবে, বায়ুদূষণের মোকাবিলায় কোন সদর্থক ব্যবস্থাই নিতে পারবে না। কয়লাচালিত শক্তিকেন্দ্রগুলি বন্ধ না করে যদি গরীব মানুষের কয়লার উনুন বন্ধ করে দেওয়া হয়, পেট্রোল ডিজেলের ব্যবহারে বেড়ি না পরিয়ে যদি গরীবে কাঠ-কুটোর জ্বালানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, তবে তা সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক হবে না। বায়ুদূষণের উৎসের চিহ্নিতকরণ করা হোক সঠিকভাবে এবং দূষণে প্রতিটি উৎসের আনুপাতিক মাত্রা নির্ণয় করা হোক। এই অঙ্ক বিচারের যথার্থতায়, হাজার হাজার নামী দামী মোটরগাড়ির দ্বারা বায়ুদূষণের সম্মিলিত মাত্রা হবে গরীব তেলেভাজাওয়ালার কয়লার উনুনের মিলিত দূষণমাত্রার থেকে অনেক বেশি। পরিবেশ নীতি নির্ধারকরা কি পদক্ষেপ নেন, তার জন্যই এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

1. WHO|WHO.Global Urban Ambient Air pollution database (update 2016) https://www.who.int>data>cities
2. https://timesofindia.indiatimes.com, 02 May, 2018
3. AQI Bulletin Archive–CPCB cpcb.nic.in> AQI_Bulletin
4. Year End Report 2018 – Ministry of Petroleum ...Press Information Bureau. pib.nic.in>Press Release Detail
5. The Lancet Commission on pollution and health-societyforindoorenvironment.net> pdf
6. https://www.wbsedcl.in>irj>new-website
7. Nagpur : www.hindustantimes.com
8. আনন্দ বাজার পত্রিকা : ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭, ১, ২ জানুয়ারী, ৯, ২৮ নভেম্বর ২০১৮
9. এই সময় সংবাদপত্র : ৩০ জানুয়ারী, ৮ মার্চ, ২৬ এপ্রিল, ১২ নভেম্বর ২০১৮

জেল পেন বা স্পেস এজ বল পয়েন্ট পেন কিভাবে এল

নিখিলেশ পাল
E-mail : nikhiltelemaker@gmail.com

পেন নিচু করলে তরল কালি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নীচের দিকে প্রবাহিত হতে চায়, পেনের নিব বা বল-পয়েন্ট তার প্রলেপে লেখা ফুটিয়ে তোলে। পেনের মুখ উঁচু করে ধরলে এই গ্র্যাভিটি-ফ্লো হয় না, লেখাও পড়ে না। মহাকাশযানের ভেতরটা প্রায় গ্র্যাভিটি-শূন্য, তাই সেখানে আধা-কঠিন 'জেল' আকারে কালিকে ঠেলার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, একই নলে উচ্চচাপে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে দিয়ে। অল্প চাপ আর নাড়াচাড়াতেই জেলকালি তরলকালিতে রূপান্তরিত হয়। জেল-এর এই ধর্মটুকু কাজে লাগিয়ে এল মহাকাশ যুগের জেল পেন...।

১৯৬০ এর দশকের মহাকাশ জয়ের প্রতিদ্বন্দিতা যখন তুঙ্গে, নাসা'র বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে সাধারণ কলম মহাকাশের শূন্য অভিকর্ষে মোটেই কাজ করছে না। তখন তারা বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে এমন একটি কলম উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন যা কিনা মহাকাশযানের অভিকর্ষহীনতায় পেনের কালিকে টেনে বার করে কাগজে দাগ ফেলতে পারে। যদিও তখন মার্কিন প্রতিদ্বন্দী, সোভিয়েত সংস্থাটি তাদের মহাকাশচারীদের হাতে সাধারণ গ্রিজ পেনসিলই (আমারা যাকে মোম পেনসিল বলি তারই একটু উন্নত সংস্করণ) তুলে দিয়েছেন।

প্রথমদিকে আমেরিকান নভশ্চররা সোভিয়েতদের মতোই পেনসিল ব্যবহার করেছিলেন, অন্তত নাসা'র ইতিহাস লেখকদের তাই বক্তব্য। বস্তুত ১৯৬৫ সালে হিউজটনের টাইটান ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাছে নাসা ৩৪টি পেনসিলের বরাত দিয়েছিলেন, ৪৩৮৯.৫০ ডলারে, তখন ভারতীয় মূল্যে ১,৭৬, ০০০/- টাকায়। অর্থাৎ প্রতিটি পেনসিলের দাম ১৮২.৮৯ ডলার বা ৫২০০ টাকা। এই তথ্যটি সংবাদ হয়ে যাওয়ায় মার্কিন নাগরিকদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় কারণ কিনা তাদের কর দেওয়া টাকায় নাকি এইসব খামখেয়ালিপনা। নাসার কর্মকর্তাদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়, আরও সস্তার কোন বিকল্প সন্ধানে নামার কথা ভাবেন তাঁরা।

মহাকাশযানে পেনসিলের ব্যবহার যে খুব একটা সুবিধাজনক ও যুক্তিসঙ্গত নয়, তাতো তাদের মনেই হচ্ছিল। কারণ পেনসিলের ডগা গুঁড়ো হয়ে বা ভেঙ্গে গিয়ে মরচের মত খসে পড়ে মহাকাশযানের মাইক্রো গ্র্যাভিটিতে (প্রায় ভারশূন্য অবস্থায়) রুদ্ধ মহাকাশযানের ভিতর ভেসে বেড়ালে, নভশ্চরদের পোষাকে বা সূক্ষ যন্ত্রপাতি বা কি-বোর্ডের ফাঁকফোকরে ঢুকে চরম বিপদ ঘটাতে পারে। পেনসিলের শিষ কিছুটা দাহ্য পদার্থও বটে। অতীতে অ্যাপেলো-১ রকেটটির উৎক্ষেপণের আগেই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময়ে, জানা অজানা বিচিত্র কারণে আগুন লাগার একটা ভীতি-তো নাসার ছিলই।

ইতিমধ্যে পল সি ফিসার, বলা ভাল তার ব্যবসায়িক সংস্থা ফিসার পেন কোম্পানী, পুরো এক মিলিয়ন ডলার (তৎকালে ভারতীয় মুদ্রায় ৪ কোটি টাকা) ঢেলে দিয়েছেন এক নূতন ধরনের পেন উদ্ভাবনে যাকে আমেরিকা ও ইউরোপে ও সম্ভবত অন্যান্য দেশেও ডাকা হবে স্পেস পেন নামে। সাফল্যও পেলেন শীঘ্রই। তারপর এই কৌশল (ডিভাইস) ফিসার পেটেন্ট করলেন ১৯৬৫ সালে। 'নিব' নীচের দিকে করে দীর্ঘক্ষণ লেখা যেতে পারে এমনকি মাইনাস ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের হিম শীতল আবহাওয়ায় বা ৪০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ঝলসানো পরিবেশেও লেখা ফুটে ওঠে। জল বা অন্য কোনও

তরলে ডুবিয়েও পেনটি লিখতে পারে। তবে তপ্ত আবহাওয়ায় কালির স্বাভাবিক নীল রং রূপান্তরিত হয়ে যায় সবুজে। ফিসার এই পেনের নানান বাহাদুরির কথা নাসাকে জানালেন। এ.জি.৭ অর্থাৎ এ্যান্টি গ্র্যাভিটি-৭ স্পেস পেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাশ করার পর যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭-র পর থেকে আসন্ন চন্দ্রাভিযানে ও ভবিষ্যতের সমস্ত মহাকাশ অভিযানেও তা ব্যবহার করার জন্য মনস্থ করলেন।

গ্র্যাভিটি শূন্য অবস্থায় কাজ করার জন্য ফিসার যা করেছিলেন তা হল, বন্দুকের টোটার মতো দেখতে লম্বা কার্টিজ-এ কালির সাথে ভরে দিয়েছিলেন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩৫ পাউন্ড চাপের নাইট্রোজেন গ্যাস যা সমুদ্র পৃষ্ঠে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলীয় চাপের প্রায় দ্বিগুণেরও একটু বেশী। এই গ্যাসের চাপটাই কার্টিজের কালিকে পেনের ডগায় টাংস্টেন কার্বাইডের তৈরী অতি ক্ষুদ্র একটি বলের দিকে ঠেলে দেয়। এই কালিটাও রাসায়নিক উপাদানে ও ভৌতধর্মে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। এই কালিটা সাধারণ পেনের কালির থেকে আলাদা। ঘন জেলির মতো 'প্রায় কঠিন' অবস্থার একটি পদার্থ যা কিনা পেনের ডগার ঐ টাংস্টেন কার্বাইড বলে চাপ পড়লেই বা বলটি নড়াচড়া করলেই তরলে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কাগজে দাগ ফেলে। আর ঐ চাপে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাসটা বাইরের বাতাসকে কালির সাথে মিশতে বাধা দেয় যা 'জেল বল পয়েন্ট পেনের' কালির জারিত (অক্সিডাইজড) হওয়াকে আটকায়, আবার কালির বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকেও বন্ধ করে দেয়।

অ্যাপেলোর চন্দ্রাভিযান কর্মসূচীতে লেখার কাজ সহজসাধ্য করে দেবার উৎকর্ষতা-ই শুধু স্পেস পেনের বাহাদুরি নয়, নির্মাতা ফিসারের মতে অ্যাপেলো-১১-র যে নভশ্চররা চাঁদের বুকে প্রথম হাঁটলেন সেই 'লুনার মডিউল'-এর (চন্দ্র পৃষ্ঠে নামবার জন্য কক্ষপথে ঘুরতে থাকা মূল মহাকাশযান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তুলনামূলক ছোট যে মহাকাশযান) ইঞ্জিন সক্রিয়করণের (engine activating switch) একটি ভেঙে যাওয়া সুইচকে সারাইয়ের কাজে ঐ ধাতব বল পয়েন্ট কলমটিকে কোনভাবে কাজে লাগিয়ে মডিউলটিকে চালু করেন। আর এই সারাইয়ের জন্যই চাঁদের মাটি থেকে উঠে এসে কক্ষপথে অপেক্ষারত মূল মহাকাশযানের (mother ship) সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের পৃথিবীতে ফেরা।

তথ্যসূত্র : সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান, ইন্ডিয়া, অগষ্ট ২০০৭

অনুপ্রেরণা : মেঘদূত, ভরত, সাওনি ও বনলতা।

নিয়মিত প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা

নিজে পড়ুন ও অন্যদের পড়ান

অসুখ বিসুখ - ২৫৪ লেকটাউন বি ব্লক

(M : ৯০৩৮৯৯৪৯৩/৮৫৮৩৯১২০০৬)

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য, শ্রমজীবী হাসপাতাল-বেলুড় (বালি)-এর মুখপত্র

হারিয়ে যাচ্ছে আমার চেনা শহর

ওমপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী
E-mail : omprakashchakrabarti@gmail.com

এ কোলকাতার ভেতর আছে
আর এক কোলকাতা।
এ শহরের কথায় আড়াল
ও শহরের কথা।

এ কোলকাতার উছল জীবন
'সব পেয়েছি'র দেশ,
ও কোলকাতায় আকাল বুঝি
হচ্ছে না আর শেষ।

এ কোলকাতায় প্রাচুর্যের হাট
রাখ ঢাক নেই তাতে,
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
ও কোলকাতার পাতে।

এ কোলকাতার বাঁচায় মরায়
খাটান দেওয়ার দায়—
ধুঁকতে থাকা ও কোলকাতার
দম বেরিয়ে যায়।

এ কোলকাতা সব সময়ে
তক্কে তক্কে থাকে,
সুযোগ পেলেই গিলতে আসে
ও কোলকাতাটাকে!

এ কোলকাতার গায়ে ওঠে
তিলোত্তমার সাজ,
ও কোলকাতার মানুষগুলো
কোথায় যাবে আজ?

নাদুস নুদুস এ কোলকাতা—
বাড়ছে দেহের বহর,
হারিয়ে যাচ্ছে ও কোলকাতা
আমার চেনা শহর!

With Best Compliments from :

AIMBE

36/1/1/2D, Pulin Khatick Road, Kolkata 700 015
Contact No.: 9330446711 (2 p.m. to 8 p.m.)

Service for

Pest Control ● Dusting & Cleaning ● Book Preservation ● White Ant Treatment
Termite Control ● General Order Supply

References :

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office etc.)
Colleges (Libraries & Laboratories)

Banks

Central & State Goverment Offices

পরিবেশ, প্রযুক্তি ও বাজার অর্থনীতি

দূষিত বাতাস এখন পৃথিবীর শহরে মানুষজনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমাদের দেশের দিল্লি, কলকাতা, কানপুর, ফরিদাবাদ, আগ্রা, লখনৌ, বারাণসীর বায়ুদূষণ আর প্রতি শীতে এর ফলে তৈরী হওয়া ধোঁয়াশা বা স্মগের কথা সবাই জানে। বাতাসের গুণমান সূচক বা AQI, পার্টিকুলেট ম্যাটার (পি এম ২.৫ এবং পি এম ১০) নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড আজকাল সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই জায়গা করে নেয়। কয়লা, ডিজেল, পেট্রল, কেরোসিনের মত প্রচলিত জ্বালানীর বহুল ব্যবহার বাতাসের গুণগত মান খারাপ করে যার প্রভাব সরাসরি পড়ে জনস্বাস্থ্যের ওপর। এইসব প্রচলিত জ্বালানীর দহনে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় জনস্বাস্থ্যের ওপর তার সরাসরি প্রভাব না থাকলেও ভূ-উষ্ণায়ণে এবং বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সাবধান করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। গত ১ অক্টোবর, ২০১৮ রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি) একটি রিপোর্ট পেশ করে জানিয়েছে, উষ্ণায়ণের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভারতের অবস্থাও শোচনীয়, অদূর ভবিষ্যতেই মারণ তাপপ্রবাহের সম্মুখীন হতে হবে এই দেশকে। গরমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে মেগাসিটিগুলো, যার তালিকায় সবার ওপরে থাকছে কলকাতা। রিপোর্ট বলছে গত দেড়শো বছরে কলকাতার গড় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিল্লির তাপমাত্রা বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে মুম্বই ও চেন্নাই। উন্নয়নের বাড়বৃদ্ধি এই ভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সামগ্রিকভাবে ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা এখনই গত ১৫০ বছরের তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। আইপিসিসির রিপোর্ট বলছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ সেলসিয়াসেই বেঁধে রাখতে হবে। কিন্তু এখন কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা যে হারে বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে, এর ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়বে যা ডেকে আনবে ঝড় এবং প্লাবন, বিপন্ন হবে ব-দ্বীপ এবং দ্বীপরাষ্ট্রগুলো। ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ বিশেষ করে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গু দ্রুতহারে ছড়িয়ে পড়বে, আরও কি কি বিপদ যে অপেক্ষা করে রয়েছে তা গবেষণাসাপেক্ষ। এখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে রাখতে হয় তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে 'কার্বন-নিরপেক্ষ' হতে হবে। 'কার্বন-নিরপেক্ষ' হওয়া মানে প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যে সমতা রাখা— এই মতবাদ পোষণ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাইমেট রিসার্চ প্রোগ্রামের প্রধান এবং আইপিসিসি রিপোর্টের মূল লেখক মাইলস অ্যালেন। এই নিরপেক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রতিবছর আনুমানিক ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ডলার শক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে যা বিশ্বের জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ। রিপোর্ট বলছে 'কার্বন নিরপেক্ষ' হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি হল গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরী কমানো, যার জন্য সবার আগে প্রয়োজন লাগামছাড়া উন্নয়নে রাশ টানা আর গ্যাজেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। প্রচলিত জ্বালানীর বদলে জৈব জ্বালানী বা বায়োফুয়েলের ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ তৈরীর কাজে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তির মত অপ্রচলিত শক্তিগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে। আরও বেশী হারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে আর অবশ্যই বাঁচাতে হবে জঙ্গল। এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে এতো সেই নতুন মোড়কে পুরানো তত্ত্বেরই পুনরাবৃত্তি। আসলে তা নয় এখানে নতুনত্ব কিছু আছে। তা হল— কলকাতার অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছে, ফলে সমুদ্রে জলস্ফীতি দেখা দিলে এই শহরও প্লাবিত হবে, তাতে রাজ্যের পরিবেশ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বেজায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও। আইপিসিসি-র রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে জানার

সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। কমিটিতে পরিবেশবিদ, ভূ-বিজ্ঞানী, ভূ-তত্ত্ববিদসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। বিশ্ব-উষ্ণায়ণ ঠেকাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে যে যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে সে সব রূপায়ণে রাজ্যের তরফে 'কার্যকরী পদক্ষেপ' করা হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে যে পরামর্শগুলো রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে দেওয়া হয়েছে তার জন্য দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বড়সড় বদল প্রয়োজন, সেই সঙ্গে শিল্প ও কৃষিনীতিও বদলাতে হবে। এখানে সাধারণ নাগরিকের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে রাজ্য সরকারের পক্ষে এত ব্যাপক বদলের জন্য নীতি নির্ধারণ এবং তার প্রয়োগ কি সম্ভব? আমরা দেখছি শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ কোর্ট বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছে সেটুকুও সরকারী তরফে মেনে চলা হচ্ছে না।

সারা বিশ্বের মানুষ আজ চাইছে নির্মল পরিবেশ যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড সহ অন্যান্য দূষক উপাদানের পরিমাণ হবে কম, এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পরিবেশনীতি। এই প্রযুক্তি ও পরিবেশ আজ সমগ্র পৃথিবীকে ভাবাচ্ছে। 'প্রযুক্তি' ও 'পরিবেশ' অর্থনীতিতে কি ভূমিকা পালন করে তা নব্বই-এর দশকে তাত্ত্বিকভাবে হিসাব করে দেখিয়েছেন দুই বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদ— পল এম রোমার ও উইলিয়াম ডি নর্ডাউস। এই তত্ত্বের জন্য তাঁরা এই বছর (২০১৮) যুগ্মভাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নর্ডাউস তাঁর 'ইন্টিগ্রেটেড অ্যাসেসমেন্ট মডেল' তত্ত্বে দেখিয়েছেন ঃ

১. কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হয়
২. কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের সঙ্গে মানুষের জ্বালানীর ব্যবহার কিভাবে পাল্টায়
৩. বাজার-অর্থনীতির চাহিদা-জোগান কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের নিঃসরণ মাত্রা নির্ধারণ করে
৪. 'কার্বন ক্রেডিট'এর মত নীতিতে কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা পাল্টায়
৫. অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ও উন্নয়নের ওপর কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রার কি প্রভাব পড়ে

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি শুধু যে বিশ্বউষ্ণায়ণ ঘটায় তা নয়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ও সামগ্রিক উন্নয়নের ওপরও তার যথেষ্ট প্রভাব।

তথ্যসূত্র :

১. https://www.nobelprize.org>summary
২. The Statesman ৯ অক্টোবর ২০১৮
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ অক্টোবর ২০১৮

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী

কালধ্বনি

যোগাযোগ : ২/১এ আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ইমেল : kalodhvani/yahoo.co.in, M : ৯৮৩০২২৭১৮৬

মানুষ মানুষের জন্য ?

ভূপেন হাজারিকার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানের এই শব্দগুলি কানে গেলেই ভারতীয় মাত্রেরই হৃদয়ে পরানুভবের অনুভূতি দোলা দেয়, তা নিশ্চিত। ভারতীয়রা কেন পৃথিবীর অনেক মানুষই এখনও ভাবতে পারে না, যে সমষ্টিগত জীবনযাপন মানুষের নয়, সামাজিক জীবনচারণ মানুষের নয়, মানুষের মানুষকে আজ আর প্রয়োজন নেই।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের বাঁচার যে তাগিদ তার বিপরীতে একা থাকার মানসিকতা আজ মানুষকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসেছে। তার জীবনবৃত্ত কেন্দ্রে শুধু তাকে ঘিরে আবর্তিত হলেই সে যারপরনাই খুশী। সেখানে দ্বিতীয় কারুর অস্তিত্বের না আছে দরকার, না আছে তার জন্য একাকীত্ব-অভিলাষী মানুষটির কোন অভীপ্সা। সে যেন চাইছে এক সদস্যের পরিবারের বাসিন্দা হতে।

ব্যাপারটা আমাদের মত দেশে কেমন আজব মনে হলেও, বাস্তবে কিন্তু ঘটছে।

খবরে প্রকাশ, জাপানের তেত্রিশ শতাংশের মত পরিবার আজ এক-সদস্যের। তাদের মধ্যে একা থাকার বাসনা প্রবল। তাঁরা অন্য কারুর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়, তাদের বাঁচার জন্য অন্য দ্বিতীয় কারুর অস্তিত্বকে তারা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। এই যে মানুষের একাকীত্ব-প্রিয়তা এরই মধ্যে 'বাজার' বিরাট এক আর্থিক মুনাফার খোঁজ পেয়েছে। বাজারের অধীনে 'প্রযুক্তি'ও উঠে পড়ে লেগেছে নিত্য-নতুন উদ্ভাবনের মনোমুগ্ধকর পসরা নিয়ে হাজির হতে। তৈরী হচ্ছে একক উপভোগের জন্য নানা ধরনের উপকরণ। নির্মাণ হচ্ছে একা গান গাওয়ার জন্য পার্লার— সেখানে মানুষ তার পছন্দের যন্ত্র-অনুষঙ্গে একাই গান গাইবে, শুধু নিজেরই জন্য, নিজেকেই শোনাতে— এমনিই প্রযুক্তি-সক্ষম বন্দোবস্ত। মাল্টিপ্লেক্স-এ গড়ে উঠছে একক আসনের বিশেষ কেবিন, যেখানে মানুষ অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাই সিনেমা দেখবে— অথচ বাড়ী না থেকে প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার বিলাসটুকুও হবে, মুদির দোকানী কেবল একারই প্রয়োজনের চাল-ডাল-তেল-নুন ইত্যাদির বিশেষ প্যাকেজ তৈরী করছে এই অসংস্রব-কামীদের অভিলাষ মেটানোর জন্য, বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থা একক ভ্রমণার্থীর বিশেষ প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে রেখে ট্যুর প্যাকেজ তৈরী করছে ইত্যাদি।

খবরে আরও জানা গেছে জাপানের কমবয়স্কদের মধ্যে এই স্বেচ্ছা-অসংস্রব প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুততায় ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

আশঙ্কাটা ঠিক এখানেই। প্রযুক্তি বিপ্লব কি তাহলে মানুষের সামাজিক-কাঠামোর যে ভিত্তিভূমি, অর্থাৎ, যূথবদ্ধ্যতা, গোষ্ঠীবদ্ধতা তাকে ভেঙে চুরমার করতে উদ্যত ? প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ আজ আপাতভাবে অনেকটাই স্বাধীন, স্ববশ। কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে মানুষের যত কিছু শুভ, চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলসাধন তা তো তার যূথবদ্ধতার, সামাজিকতার কারণেই। মানবসমাজের ক্ষতির উদ্রেক যখনই হয়েছে, এই সবুজগ্রহে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নে যখনই শংকা এসেছে, মানুষই তখন সামাজিক অবলম্বনের হাত ধরেই তার প্রতিবিধান করেছে। মানুষের সংকটে, মানবিকতার সংকটে সমাজ এগিয়ে এসে যুগে যুগে প্রমাণ দিয়েছে, মানুষ মানুষের জন্য। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এই একা হওয়ার, একা-থাকার, বিপরীত মানসিকতা কেন ?

আমাদের দেশেও দেখি, কমবয়স্করা তাদের মুঠোফনে সারাদিন বুঁদ হয়ে রয়েছে। চূড়ান্ত একাকিত্বের অনুষঙ্গে তাদের দাবি তারাও সামাজিক— তারাও যোগাযোগের একটা অবলম্বনে বিশ্বাস করছে, চায়ের ঠেক নয়, রকের আড্ডা নয়, কফি হাউসে সকলে মিলে গল্প করার উষ্ণতা নয়, সব ছেড়ে একাকিত্বের পরিসরে বদ্ধ থাকার এই ব্যবস্থার নাম সামাজিক মাধ্যম— যা একান্তভাবেই যন্ত্রনির্ভর, প্রযুক্তি-নির্ভর। সমাজ বিমুখীনতার একি সর্বনাশা হাতছানি ! বিজ্ঞান-ও-প্রযুক্তি কি তাহলে বাজারের পরবশ হয়ে মানুষের সামাজিক কাঠামোটাকে খান খান করে একক মানুষের সমাজের জন্ম দিতে চলেছে ? তাই কি এই অসংস্রব-প্রিয়তা এতটাই জনপ্রিয় কমবয়েসীদের মধ্যে ? ভেবে দেখার বিষয় !

তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ নভেম্বর, ২০১৮

অভী দত্ত মজুমদার স্মারক বক্তৃতা

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট সভাগৃহে (বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়্যার, কলকাতা) গত ২৬শে জুলাই, ২০১৮, পঞ্চম বার্ষিক 'অভী দত্ত মজুমদার স্মারক বক্তৃতা' আয়োজিত হল। আয়োজনে ছিল 'একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ' (Forum Against Monopolistic Aggresion, বা, FAMA)। অনুষ্ঠানের শুরুতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্মারক বক্তৃতার পটভূমিটি তুলে ধরা হয়। অপ-উন্নয়নের রাশকে আটকানোর প্রেক্ষাপটে ফামার জন্ম বৃত্তান্তকে স্মরণ করে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের গণ-প্রতিরোধ (দল ও সরকারের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা ও প্রতিহত করে) ফামার জন্মের প্রেরণা হিসাবে কিভাবে কাজ করেছিল, তার বিবরণ রাখা হয়। কৃষিতে জিন-বদলানো শষ্যের চাষ আমদানির বিরুদ্ধে, বহুজাতিক বীজ কম্পানিগুলির হাতে ভারতের খাদ্য-সুরক্ষার বিষয়টিকে সঁপে দেওয়ার বিরুদ্ধে, পূর্বভারতে বহুজাতিক ও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব, আধার কার্ড, খুচরো ব্যবসায় বড় পুঁজির অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ফামা যে লাগাতার প্রচার-অনুষ্ঠান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, এই কর্মকান্ডের মূল প্রাণপুরুষ হিসাবে অধ্যাপক অভী দত্ত মজুমদারের উৎসাহ-উদ্যোগ স্মরণ করা হয়। ২০১৩'য় অধ্যাপক দত্ত মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যুতে ফামার কাজকর্মে বেশ খানিক ক্ষয়ক্ষতি হলেও, শুরুর প্রথম থেকেই ফামা যে আদর্শে কাজ করছে, তার কোন বিচ্যুতি ভবিষ্যতে হবে না, তা জোরের সাথে বলা হয়।

পঞ্চম বার্ষিক 'অভী দত্ত মজুমদার স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন প্রখ্যাত পরিবেশ ও সমাজকর্মী, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক অসীম শ্রীবাস্তব। বিষয় ছিল: ''উন্নয়ন না মৃগয়া : কর্পোরেট ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ।" ভারতে বিশ্বায়নের সামাজিক, আর্থিক ও বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন বক্তা। বিশ্বায়ন পরবর্ত্তীতে ভারতে আর্থিক সংস্কারের নামে যেভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক সম্পদের ধ্বংস শুরু হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন শ্রী শ্রীবাস্তব। প্রকৃত উন্নয়ন কোন অর্থেই পরিবেশ ধ্বংস করে না। তাকে পালন করে, রক্ষা করে, শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে সমৃদ্ধ করে। পরিবেশ-বিনষ্টি না ঘটিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন বক্তা।

সভায় ফ্যাসিবাদ ও পুঁজির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গুজরাতের উনার দলিত আন্দোলনের নেতা, সমাজকর্মী ও গুজরাট বিধানসভার নির্দল বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানির বক্তৃতা দেওয়ার কথা থাকলেও, বিশেষ অসুবিধার কারণে শ্রী মেভানি আসতে পারেন নি। ভিডিও-কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা করেন। 'একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চে'র মুখপত্র 'দ্রোহভাষ'-এর প্রথম প্রকাশনার (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৮) উদ্বোধন হল সভায়।

কোটানিস দিবস উদযাপন

ড. দ্বারকানাথ কোটনিস ১৯৩৮ সালে চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সদস্য ছিলেন যিনি ১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর প্রয়াত হন। ড. দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি (পশ্চিমবঙ্গ),

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭, এই মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী মানুষটির ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৮-য় সুকিয়া স্ট্রীট ও এপিসি রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত রামমোহন লাইব্রেরীর হলে একটি সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'কোটনিস দিবসে'র এই সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি ড. মৃগেন গাঁতাইত। সভার মুখ্য বক্তা হিসাবে 'ভারতবর্ষের স্বাস্থক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক পুঁজির আগ্রাসন' শীর্ষক ভাষণটি দেন ড. সিদ্ধার্থ গুপ্ত। সরকারী তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার বদলে চিকিৎসার ক্ষেত্রটির ব্যাপক বেসকারীকরণ, সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের চিকিৎসার পরিকাঠামোর সংস্কার, প্রসার ও উন্নতির বদলে স্বাস্থ্যবীমা প্রচলনের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া (কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারী স্তরে), জেনেরিক অল্পমূল্যের ওষুধের নিরাপদ ব্যবহারের উপর জোর না দিয়ে, বহুজাতিক সংস্থার পেটেন্টেড্ ওষুধ প্রস্তুতিকরণ, বিপণন ও মুনাফা-কেন্দ্রিক ব্যবসায় সরকারের উৎসাহ প্রদান, সকলের জন্য স্বাস্থ্যের জাতীয় অঙ্গীকার থেকেই কার্যত সরে আসা বলে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন বক্তা। ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরেই সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক পুঁজির কি ভয়ঙ্কর আগ্রাসন ঘটছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করেন ড. গুপ্ত।

কমিটির সদস্য ও সহযোগী বন্ধুরা মিলে মঞ্চস্থ করেন 'ইন্টারন্যাশনালিষ্ট' নাটকটি। চীনে প্রেরিত ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের কাজকর্ম এবং ড. দ্বারকানাথ কোটনিসের চিকিৎসা-সেবা প্রদানের মর্মন্তুদ কাহিনী, তাঁর জীবনবোধ, জনহিতে কৃচ্ছসাধন ও আত্মত্যাগ, সর্বোপরি মহান জীবনাদর্শকে সাধারণ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরাই নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। বিশিষ্ট নাট্যকার অমল রায়ের লেখা নাটকটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সভ্য ও 'নটধা' নাট্যগোষ্ঠীর একনিষ্ঠ নাট্যকর্মী বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগঠন সম্পাদক শ্যামল ঘোষ, শত অসুবিধা সত্ত্বেও ড. বিজয় কুমার বসু ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস কর্তৃক ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিটি পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাবে, এ অঙ্গীকার করেন।

পুরুলিয়া জেলায় জৈব চাষবাস—একটি আলোচনা শিবির

গত ১৭ই মার্চ, ২০১৮, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Folk Rice Conservation and Organic Farming in Purulia District' বিষয়ে যে কনভেনশন করা হয়েছিল তার থেকে উঠে আসা পথেই পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের বেগুনকোদর পঞ্চায়েতের 'দীপশিখা মহিলা স্বনির্ভর সঙ্ঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড'-কে সঙ্গে নিয়ে জৈব পদ্ধতিতে ২০০ বিঘা জমিতে কালো ধানের চাষ করা হয়। আশাব্যঞ্জক উৎপাদনও পাওয়া গেছে।

উক্ত চাষাবাদ করতে মাঠে নেমে সহযোগিতা করেছিলেন ড. পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, ড. অনুপম পাল, অভ্র চক্রবর্তী এবং রফিকুল আলম সাহানা। সঙ্ঘের সদস্যদের হাতে কলমে জৈব সার উৎপাদন করতে শিখিয়েছিলেন সুজয় কৃষ্ণ জানা, প্রদীপ কুমার খাটুয়া, ঝন্টু কুমার বর, দেবব্রত সর্দার, চন্ডীপদ বর, গোকুল সাউ ও অনন্ত কুমার গিরি।

আগাছা নাশক ও তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গ্রামে গ্রামে গিয়ে বুঝিয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয় শান্তনু মিত্র।

উক্ত সঙ্ঘের সদস্যরা আগামী মরসুমে ৭৫০ বিঘায় জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে চাইছেন। কিন্তু

জৈব চাষাবাদের প্রয়োজনীয় গোবর, গোচনা ওই ব্লকে নেই। তাই চাষাবাদের জন্য ২০০ দেশী গরুও পালন করতে চান। তৎসহ আদিবাসী নারীদের ইচ্ছা মৌমাছি পালন।

এ ধরনের কাজ সম্ভব হবে কিনা জানা নেই। এই সব বিষয় নিয়ে আগামী ৯ই মার্চ, ২০১৯, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের 'মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়াম'-এ সকাল ১০টা থেকে সারাদিন ধরে চলবে আলোচনা, নিতে হবে সিদ্ধান্ত।

ঐ সভায় অভিজ্ঞতা জানাবেন সঙ্ঘের মহিলারা, অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন অন্যান্য জায়গায় যাঁরা জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন।

উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ দেবেন অর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়, ড. অনুপম পাল, শান্তনু মিত্র এবং আরও অনেক বিশেষজ্ঞ ও বন্ধু।

সকলের উপস্থিতি ও সুপরামর্শের আহ্বান জানাচ্ছেন আহ্বায়ক রবীন ব্যানার্জী (মোবাইল : ৯৯০৩০৫২৩৪১ / ৭০০৩৫৬৪২৯৮)।

পাবলিক লাইব্রেরী : কোন ভবিষ্যতের দিকে— একটি আলোচনা

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮তে শ্রীভূমির 'গান্ধী সেবা সংঘ'-এর লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে সংঘের 'মাণিক্য মঞ্চে' উক্ত বিষয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সূচনায় লাইব্রেরীর সভাপতি অধ্যাপক হিরণ্ময় সাহা স্বাগত ভাষণ দেন। লাইব্রেরীর কাজকর্ম বিষয়ে শ্রোতাদের অবহিত করেন অন্যতম কর্ণধার শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। 'আত্মবিকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক শ্রী শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জন্মতিথি (২৯শে সেপ্টেম্বর) উপলক্ষ্যে তাঁর অবদানের তাৎপর্য স্মরণ করেন।

এরপর সাধারণ গ্রন্থাগার তথা পাবলিক লাইব্রেরীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মূল আলোচনাটি করেন আমন্ত্রিত বক্তা শ্রী রবীন মজুমদার। তিনি কাছাকাছি কালিন্দী-এলাকার বাসিন্দা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে অধ্যাপক মজুমদার বলেন, সম্রাট অশোকের শিলালিপিই সম্ভবত সাধারণ গ্রন্থাগারের আদিতম রূপ। তারপর কত শত উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছে সাধারণ গ্রন্থাগার। চল্লিশ হাজার প্যাপিরাস-পুঁথির সংগ্রহ নিয়ে প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার বিব্লিওতেকও আক্রান্ত ও ধ্বংস হয়েছিল। নালন্দার ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারও কয়েকশো বছর ধরে আক্রান্ত হয়েছে আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। পুঁথি-নথির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা করার যে গ্রন্থাগার-সংস্কৃতি তা কিন্তু ধ্বংস করা যায় নি। বার বার নতুন উন্নততর রূপে তা ফিরে এসেছে। সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম দ্যোতক হল সাধারণ গ্রন্থাগার। ইউরোপের নবজাগরণ, ছাপাখানার আবিষ্কার এবং মুদ্রিত বই-এর মাস-প্রোডাকশন সাধারণ গ্রন্থাগারকে আজকের অবস্থায় এনে দিয়েছে। এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন নবজাগরণ, শিক্ষা-প্রসার এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল এই সেদিনও।

কিন্তু এখন সেই সব খ্যাত-অখ্যাত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা বড় বেদনাদায়ক। এত ঐতিহ্যশালী একটা জনশিক্ষা ও জনসংযোগের ব্যবস্থা— সাধারণ গ্রন্থাগার— সেগুলি আজ কোথাও ঘর-বাড়ির ভগ্নদশায়, কোথাও পাঠকের অভাবে, কোথাও গ্রন্থাগারিকের অভাবে ধুঁকছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের অভিঘাতেই যেন তাদের এহেন

দুরবস্থা। এমনকি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীগুলিতেও ব্যবহারকারী দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। যে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল যে কোন লাইব্রেরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাঁরা আজ মজে গেছেন মোবাইল-ইন্টারনেট-সোশাল মিডিয়ায়। তাঁরা বহুলাংশে সাধারণ গ্রন্থাগার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

শ্রী মজুমদার স্মরণ করিয়ে দেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারের চেহারা চরিত্রের বিবর্তন ঘটেছে টেকনোলজির বিবর্তনের হাত ধরে। লিপি ও ভাষার আবিষ্কারের সঙ্গে যেমন তথ্য ধরে রাখার কৌশল পাল্টেছে তেমনি ছাপাখানা আধুনিক হয়ে উঠে একসঙ্গে অনেক অনেক বই-তে মুদ্রিত হতে পেরেছে। একই সঙ্গে সেসব সংরক্ষণ, নথিভুক্তি ও ব্যবহারের কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে, ক্রমশ আরও বেশী বেশী সংখ্যক ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মেটাতে পেরেছে। আজকের তথ্য-প্রযুক্তিও সেই ধারাতেই নতুন সংযোজন। এই প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে সাধারণ গ্রন্থাগারকে আরও জনমুখী এবং বহুমুখী হয়ে উঠতে হবে। তেমনটাই ঘটছে ইউরোপ-আমেরিকায় — উদাহরণ সহযোগে— স্লাইড ছবি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করেন শ্রী মজুমদার। সাধারণ গ্রন্থাগারের মৃত্যুর অর্থ ইতিহাসের থেমে যাওয়া, সভ্যতার অপমৃত্যু। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষ সচেতন হয়ে তাই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নবরূপায়ণ ঘটাচ্ছেন। আমরা কি তাতে সামিল হব, তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করব নাকি তথ্যপ্রযুক্তিতে আক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেব?— প্রশ্ন রাখেন বক্তা।

এ রাজ্যের মোটামুটি আড়াই হাজার সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্য-সক্ষম করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন— জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করা, কপিরাইটমুক্ত বই-এর ই-রূপান্তর ঘটিয়ে তাদের সহজ-লভ্য করে তোলা, গ্রন্থাগার-কর্মীর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। প্রতি বছর ৩১শে আগস্ট গ্রন্থাগার দিবস পালন, জেলায় জেলায় বই-মেলা অনুষ্ঠানও করা হচ্ছে। কিন্তু সেসবের প্রধান লক্ষ্য যেন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে 'তথ্যকেন্দ্র' করে তোলা। শ্রী মজুমদার স্মরণ করান— পাবলিক লাইব্রেরী যেমন শুধু বই-ঘর নয়, তেমনি শুধু তথ্যকেন্দ্রও নয়। সেগুলি তথ্যাগার ঠিকই, বইও একটি তথ্য উৎস মাত্র। তবে তথ্যকে যখন ব্যবহারকারী ঠিকঠাকভাবে রন্ধন করতে পারেন— তখনই তা জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়ে ওঠে, আলো দেয়, পথ দেখায়।

সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাবলিক লাইব্রেরীকে যথাযথ গুরুত্ব না দেবার প্রতি ইঙ্গিত করে শ্রী মজুমদার বলেন, এ রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারকে রাখা হয়েছে জনসংযোগ ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করে। অথচ কলকাতাতেই অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে। কেন?

বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা অনেকে আলোচনায় অংশ নেন। সভা এগিয়ে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিকে।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'-আয়োজিত বুনিয়াদি শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা

গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে (রাসবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গণ/রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ) 'আধুনিক দৃষ্টিতে বুনিয়াদি শিক্ষা' বিষয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল।

সভার প্রথমাংশে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যক্রম চালাচ্ছেন এমন দুটি সংস্থার তরফে তাঁদের প্রতিনিধিরা অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

প্রথম বক্তা— বারাসতের 'প্রত্যুষে'র প্রতিনিধি শ্রী ইন্দ্র সরকার বলেন— 'প্রত্যুষ' সরাসরি স্কুল খুলে শিক্ষার আয়োজন করে নি। তাদের কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সবাই প্রথাগত স্কুলেই লেখাপড়া করে। স্থানীয় পড়ুয়াদের মধ্যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে যারা খুবই দুর্বল ও যারা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী তাদেরই 'প্রত্যুষ' বেছে নেয় এবং কেন্দ্রে নথিভূক্ত করে। কেন্দ্রের পড়ুয়াদের বেশীরভাগই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। পড়াশুনায় সহায়তা দেবার পাশাপাশি খেলাধুলো, শরীরচর্চা, গান-নাচ-আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতির অনুশীলনেও তারা অংশ নেয়। পরিপূরক হিসেবে কিছু খাবারও দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় খরচাপাতি সবটাই নির্বাহ হয় ব্যক্তিগত দান থেকে। কেন্দ্রে স্বল্প বেতনের শিক্ষা-সহায়করা যেমন আছেন, তেমনি 'প্রত্যুষে'র সদস্যরাও সাধ্যমত শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়কের ভূমিকা নেন।

কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মায়েদের নিয়েও 'প্রত্যুষ' গড়ে তুলেছে বিভিন্ন স্বাবলম্বন কার্যক্রম। হাতের কাজ, কাঁথার কাজ, সেলাই, মশলা/খাদ্যদ্রব্য তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরী হয় নানা উপযোগী জিনিষপত্র। সেসব বিক্রীবাট্টার ব্যবস্থাও করে 'প্রত্যুষ', মায়েদের হাতে তুলে দেয় কিছু রোজগারের কড়িও। এর ফলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের পরিবারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে 'প্রত্যুষে'র সঙ্গে। ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের লেখা, আঁকা, ছবি ইত্যাদি সাজিয়ে 'প্রত্যুষ' একটা পত্রিকাও বার করেছে। নাম 'ভোরাই'। কেন্দ্রটির মত পত্রিকাটিও স্থানীয় পড়ুয়া এবং বাসিন্দাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন 'দীক্ষা এডুকেশন ট্রাস্ট'-এর শ্রী দেবাশীষ সরকার। তাঁরা কিন্তু ডিহি-গঙ্গাজোয়ারা, সোনারপুর (কলকাতা ৭০০১৫০)-এ সক্ষম ও বিশেষভাবে সক্ষম কচি-কাঁচাদের নিয়ে একটি স্কুলই চালান। এখানেও শিক্ষার্থীরা প্রধানত প্রথম প্রজন্মের এবং স্থানীয় পিছিয়ে পড়া পরিবারের। তিন থেকে বারো বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত যথাযথ গুণমানের শিক্ষা-কার্যক্রমের ব্যবস্থা আছে। লেখাপড়ার সাথে সাথে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, ছবি আঁকা, গান, নাটক, হাতের কাজ প্রভৃতিতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেবাশীষের কথায়— শিক্ষার পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যেই 'করে দেখা ও শেখার' (learning by doing) উপর জোর দেওয়া হয়। এতে শিশু-শিক্ষার্থীরা ভীষণ আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে। দল বেঁধে কাজ করা, খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চাতেও সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। শিশু শিক্ষার্থীর শারীরিক ও৯ মানসিক অর্থাৎ সার্বিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দীক্ষা এডুকেশন ট্রাস্ট', তাদের সুষম খাদ্যের ব্যবস্থাও করে। ট্রাস্টের সদস্যরাতো রয়েছেনই, কয়েকজন দিদিমণিকেও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সভার দ্বিতীয়ার্ধে বক্তব্য রাখেন তিনজন শিক্ষাবিদ যাঁরা শিক্ষকের কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন এবং এখনও তেমন কিছু কাজের সঙ্গেও যুক্ত।

হেরম্ব চন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী সলিল বিশ্বাস তাঁর ভাষণে এদেশের প্রথাগত বুনিয়াদি শিক্ষা ও পদ্ধতির বিশেষ সীমাবদ্ধতার ব্যাখ্যা করেন। দেশের এবং রাজ্যের প্রথাগত স্কুলশিক্ষার আংশিক কার্যকারিতা বা অকার্যকারিতার সাপেক্ষে বিকল্প ও যথোপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। বলেন, বিকল্প এই শিক্ষা-প্রণালী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং পদ্ধতি দাবী করে। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং মানসিকতা। শিক্ষক-নিয়োগের চালু পদ্ধতিতে শিক্ষকের মানসিকতা যাচাই-এর কোন স্থান নেই। শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসু হতে উৎসাহ দেয় না আমাদের ব্যবস্থা। এইসব মৌলিক ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার বিকল্প ভাবনা মেলে ধরেন শ্রী বিশ্বাস।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী রবীন মজুমদার ৩-৬ বছর বয়সী 'কচিশিশুদের' শিক্ষা ও বিকাশের অধিকার এবং সেই অধিকার কিভাবে হরণ করা হচ্ছে স্লাইডের মাধ্যমে তথ্য-পরিসংখ্যান সহযোগে তা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য— শিক্ষা-অধিকার আইন (২০০৯) এইসব কচিশিশুর প্রাক্-স্কুল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটুকু স্বীকার করেছিল মাত্র, নির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থার কথা বলে নি। এই ফাঁক দিয়েই বেসরকারী শিক্ষা-ব্যবসার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, তাতে এই কচিশিশুরাই হয়ে পড়ছে মাতৃভাষামুক্ত শিক্ষা-বাণিজ্যের দুর্মূল্য উপকরণ।

নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের আই.সি.ডি.এস বা অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পে অবশ্য এই শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য পুষ্টি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ছটি 'পরিষেবা'র একটি হল শিক্ষা। কিন্তু এই প্রকল্প প্রথমত গ্রামীণ ও অনুন্নত শিশুদের জন্য, দ্বিতীয়ত এর ব্যবস্থাপনার সঠিক পরিকাঠামোরও অভাব। প্রাক্-স্কুল এক বছরের শিশু-শ্রেণীও এ রাজ্যে অধিকাংশ স্কুলেই গড়ে তোলা হয়নি। সব মিলিয়ে, যে কোন এক বছরে এ রাজ্যের গড়ে ২০ লক্ষ ৩-৬ বছর বয়সী কচিশিশুর তিন-চতুর্থাংশই পুষ্টি-স্বাস্থ্য-শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত। তাঁর অভিমত, সরকার বা শিক্ষককূল তো বটেই আমরা সব বড়রাই কচিশিশুদের এই অধিকার হরণে অংশীদার।

দেশের/রাজ্যের সমস্ত ৩-৬ বছরের কচিশিশুদের জন্য সরকারী ব্যয়ে ও নিয়ন্ত্রণে বিকাশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে শিক্ষা-অধিকার আইনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। দাবী রাখেন এ রাজ্যের লক্ষাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ১৫/১৬ হাজার শিশু শিক্ষাকেন্দ্রকে অবিলম্বে শিক্ষা-সহ পূর্ণাঙ্গ শিশু-বিকাশ কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করা হোক এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব কচিশিশুর জন্য তা উন্মুক্ত হোক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়েরই বায়োফিজিক্স বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক শ্রী শুভাশীস মুখোপাধ্যায় ছিলেন শেষ বক্তা। তিনি বলেন— শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিখন-প্রণালী এই তিনটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে বুনিয়াদি তথা বিদ্যালয় শিক্ষা। কিন্তু বিগত চার দশকেরও বেশী সময় ধরে এগুলি উপেক্ষিত হয়েছে, বার বার অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বলি হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সাথে শিক্ষাঙ্গণের গোটা ক্ষেত্র জুড়ে ব্যাপক পটপরিবর্তন ঘটে, কখনও আপাতদৃষ্টিতে আশাব্যঞ্জক মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি হয় বুনিয়াদি শিক্ষার হাল যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এ রাজ্যের বর্তমান জমানাও তার ব্যতিক্রম নয়। নতুন আঙ্গিকে পাঠ্যপুস্তক তৈরী হয়েছে সরকারী উদ্যোগে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে পুস্তকগুলি আশানুরূপ হয়নি। তার চেয়েও যেটা বড় কথা নতুন পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে এত ঘাটতি আর গাফিলতি যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী অভিভাবক সকলেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রসঙ্গ : দুই দেশের কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের আত্মবীক্ষামূলক আলোচনা পড়ে পাঠকের ভাবনা

মহাশয়,

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকার জানুয়ারী-জুন ২০১৮ সংখ্যায় সুদীপ্ত সরস্বতী-র লেখা প্রবন্ধ " 'কুসংস্কার' বিরোধিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা : কোলকাতা ১৯৮৪ এবং নিউ ইয়র্ক ২০১৬" এবং অঞ্জন মজুমদার অনুদিত জন হরগ্যানের লেখার অনুবাদ আগ্রহ সহকারে পড়লাম।

সমস্ত রকম সদর্থক আন্দোলনের কর্মীদেরই যে আত্মবীক্ষণ করা উচিত এবং সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণু হওয়া উচিত, তা খুব সুন্দরভাবে লেখাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। অঞ্জন মজুমদারের অনুবাদ এত স্বচ্ছন্দ এবং ঝরঝরে হয়েছে যে ওটা যে অনুবাদ, পড়ে তা বোঝা'ই যাচ্ছে না। লেখাটি এবং অনুবাদটি পড়ে সৌমেন গুহের কাছে দুটো প্রশ্ন রয়েছে।

এক, সৌমেনবাবুর লেখাকে কেন্দ্র করে বিরূপ সমালোচনামূলক এতগুলি চিঠি গত শতাব্দীর আশির দশকে "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" (বি-ও-বি) পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সমালোচনার উত্তরে শ্রী গুহের কোন লেখা বি-ও-বি-তে প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ কী?

দুই, সৌমেন গুহ এবং জন হরগ্যানের লেখার অনুবাদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এবং হরগ্যানের লেখা পড়ে শ্রী গুহ আজকে কী ভাবছেন?

প্রশ্ন দুটি প্রসঙ্গে সৌমেনবাবু কিছুটা আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

নমস্কারান্তে—

ধীমান পাল
E-mail : dhimanpal148@gmail.com

১৫ জানুয়ারী, ২০১৯

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইন্টারনিটি প্রেসের পক্ষে

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত্যে সত্য।

স্বা : রবীন মজুমদার
প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পড়বার মত বই/পত্রিকা ও অণুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ

প্রয়াত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের একটি পরিচিতি ও ছবি উইকিপিডিয়ার নিচের দুটি URL-এ পাওয়া যাবে—

পরিচিতি : **Draft : Bishuddhananda Purokait**

http://speedydeletion.wikia.com/wiki/Draft:Bisiruddhananda_Purokait

ছবি : File : Bishuddhananda Purokait.Jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/ File: Bishuddhananda_Purokait.Jpg

বিজ্ঞান সমাজ ও মানুষ : সৌমেন গুহ'র নির্বাচিত রচনার একটি সংকলন ই-বুক হিসেবে পড়া যাবে—

https ://sites.google.com/site/saumenguha1

অধ্যাপক মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার-এর বই :

১. **পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড** (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০১৪)

২. **বাংলায় আর্সেনিক : প্রকৃতি ও প্রতিকার**, দ্বিতীয় সংস্করণ (ভাষাপ্রকাশ, সোনারপুর, কলকাতা, ২০১০)

৩. **Low-Level Chemical Pollution, Endocrine Disruption and The Imperilled Biosphere**
(Indian Social Science Congress, Allahabad, 2010)

শিবপ্রসাদ নিয়োগী'র একটি ইতিহাস সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বই ও অন্য দুটি কবিতার বই :

১. **আলো-আঁধারির উত্তরাধিকার : বাঙলার নবজাগরণ** (কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২),

২. **পিছুডাক** (নানামুখ, নিলয় রায়, ১/১ কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩৬),

৩. **নিময়ুগ** (কালধ্বনি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ২/১এ আশুতোষ শীল লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯)

অভিজিৎ লাহিড়ী'র একটি ওয়েবসাইট যেখানে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত **"Basic Physics: A Comprehensive Survey", "Science as an Interpretation of the World: Inference and Belief"** ও আরও কয়েকটি বই-এর পরিচিতি এবং পদার্থবিদ্যার উপর নানা আলোচনা পাওয়া যাবে— http:/physicsandmore.net

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী'র একটি গানের অনুবাদের এবং একটি বিজ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান-ধর্মের স্পর্শতল, মার্কসবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত বই :

1. HUNDRED SONGS OF RABINDRANATH TAGORE– *Inner journey through the original songs by way of translation* (প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪)

2. THE FORGOTTEN MESSAGES FROM THE PIOBNEER OF 'SCIENCE'
VS.
INSITUTIONAL 'SCIENCE' EDUCATION & 'SCIENTIFIC' SOCIAL ACTVISM
(রূপালী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬ ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮ / ৮৪৭৯৯১২৩৬২)

Writings of Subhas Chandra Ganguly : An Open Access E-book
https://sites.google.com/site/subhascganguly/writing

RANDOM THOUGHTS https://sites.google.com/site/writingsofsganguly/

অনুপ্রেরণাদায়ী উদ্যোগ ও পড়বার পত্রিকা :

আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, তেঘরি, বাঁকুড়া

শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড় (বালি), শ্রীরামপুর (বড় বেলু)

সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, এফ. এস. হাট, সরবেড়িয়া, মুখপত্র—লোকগাথা

মন্থন সাময়িকী, বি/২৩/২, রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা-১৮, ফোন ২৪৯১ ৩৬৬৬

প্রয়াত কবি সমর সেন প্রতিষ্ঠিত-সম্পাদিত ও বর্তমানে তিমির বসু সম্পাদিত, গত ৫০ বছর ধরে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক Frontier -এর (৬১ মট লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৩, ফোন : ২২৬৫ ৩২০২)
ওয়েবসাইট : http://frontierweekly.com

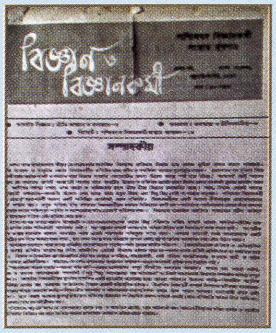

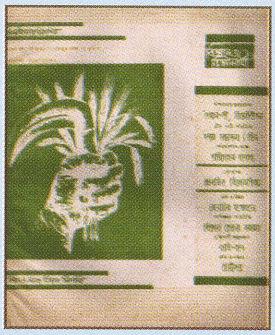

বি ও বি ও-শতকে

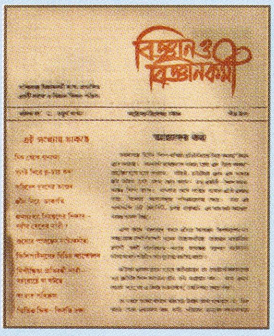

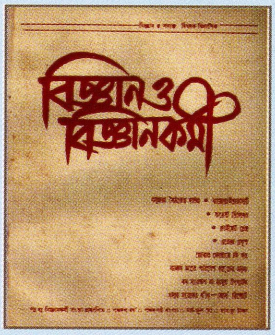

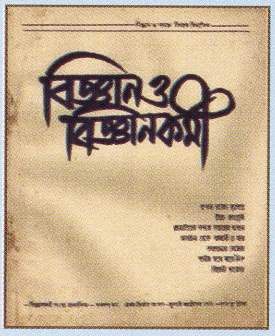

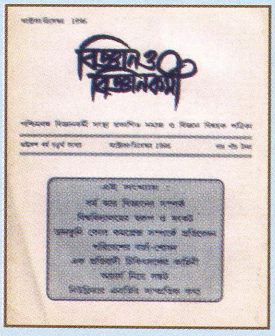

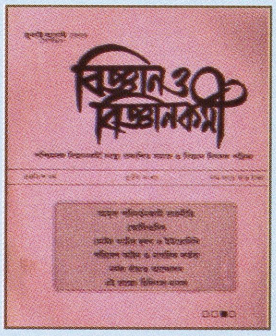

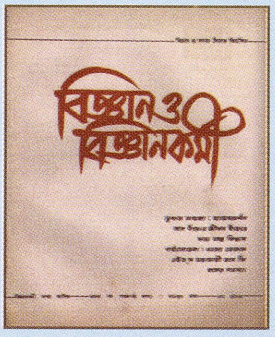

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
পড়ুন ও পড়ান
পুরোনো বি ও বি
সংগ্রহ করুন

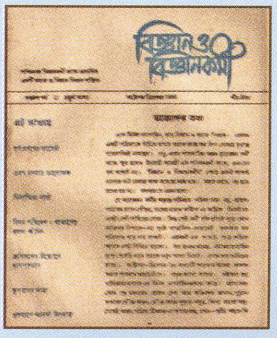

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929179

Rs.50.00

Vol. XLI No. 3-4
July 2018 - December 2018

লাগছে ফাঁস
রুদ্ধ শ্বাস

মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা বন্ধ করুন

মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে # নর্দমা এবং নিকাশীর গতিপথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে # শহরাঞ্চলে জল জমার জন্য কেবলমাত্র ভারী বৃষ্টি দায়ী নয়, এর অন্যতম কারণ প্লাস্টিক ব্যাগ # সর্বপরি বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক -এল.এ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে সঞ্জয় এন্টারপ্রাইজ, ১২৭ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।